স্বাস্থ্যের বৃত্তে

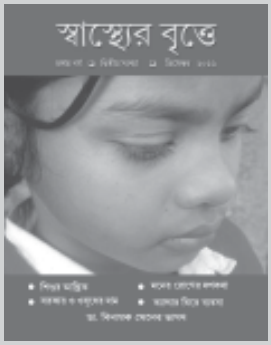

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

১ম বর্ষ ❑ ২য় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১১

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশিস কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্ত্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ডা. সোহম সরকার
ডা. তাপস মণ্ডল

অক্ষরবিন্যাস ❑ রাখী হাজরা
প্রচ্ছদ ও বিন্যাস ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

স্বাস্থ্যের বৃত্ত
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রণ

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
এবারের প্রচ্ছদ **ভালোপাহাড়**

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ২

চিঠিপত্র ৪৪

শরীর

ঘাড়ের ব্যথা ❑ ডা. সুব্রত গোস্বামী ৩
দাঁতে ব্যথার চিকিৎসা ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায় ৫
কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা ❑ ডা. সুমিত দাশ ৬

শরীর–সমাজ–চিকিৎসা

শিশুর আন্ত্রিক ❑ ডা. শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র ৯
ফিরে এসো চাকা ❑ ডা. গর্গ চট্টোপাধ্যায় ১৩
ডায়রিয়ার দু- চার কথা ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২১

মন

মনের রোগের দশকথা ❑ ডা. সুমিত দাশ ১৫

এ বারের ক্লিনিক

ত্বক বিশেষজ্ঞের মুখোমুখি ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ২৪

অণু–বীক্ষণ

এফ এন এ সি ❑ ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় ১৭

চিকিৎসা বিতর্ক

জরায়ুমুখ ক্যানসার ও এইচ পি ভি ভ্যাকসিন ❑ ডা. চঞ্চলা সমাজদার ১৯
ক্যান্সার চিকিৎসা : পরীক্ষা, প্রতিশ্রুতি ও মুনাফা ❑ ড. তুষার চক্রবর্তী ২৫

স্মরণে

বিজন ষড়ঙ্গী ❑ ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ২৮

শরীর ঘিরে রাজনীতি

ভারত সরকারের ওষুধ নীতি কি জনমুখী? ❑ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৩০
ক্ষুধা, উৎখাত : সুবিচারের সন্ধান ❑ ডা. বিনায়ক সেন ৩৫

রিপোর্টিং

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকা উদ্বোধন ২৩

বই–পড়া

শত্রুপক্ষের জীবনকথা ❑ ডা. সুস্মিতা ঘোষাল ৪০

গল্প

সাহাবুদ্দিনের জিন ❑ অহনা মল্লিক ৪২

হালকা চালে

কুইজ মাস্টারের সামনে ❑ অভিষেক দাস ৪১
হাস্য- কৌতুক ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল (সংগ্রহ) ৪৪

সম্পাদকীয়

আপনি প্রতিদিন সকালে চল্লিশ মিনিট দৌড়ান। সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যেতে জিম, প্রতি মাসে ওজন নেওয়া ও ছ'মাসে একবার সুগার কোলেস্টেরল ইত্যাদি সহ এক্সকিউটিভ হেলথ চেক আপ, ক্যালোরি মেপে খাওয়া, নো মদ নো সিগারেট, এবং সুখের সংসার। এ হেন আপনি নিজের গায়ে একদিন ছুলির মত দাগ দেখলেন, গেলেন বড় হাসপাতালে বড় বিশেষজ্ঞর কাছে, ওষুধ লাগালেন। 'ছুলি' কিন্তু সারল না। ক'দিন পরে হাতের তেলোয় পায়ের তেলোয় শক্ত গোটা বেরোল। আরও বড় হাসপাতাল আরও বড় ডাক্তার। হাজারো পরীক্ষা। অবশেষে রায় - আর্সেনিক-বিষণ! এবং সতর্কীকরণ : আপনার ক্যান্সার হতে পারে, হতে পারে হাজারো রোগ। চিকিৎসা ? দুঃখিত , এর চিকিৎসা জানা নেই কিছু।

গল্প? হ্যাঁ, গল্প, কিন্তু নেহাত গুল-গল্প নয়। পশ্চিমবঙ্গের লাখ-লাখ মানুষ আর্সেনিক-বিষণে ভুগছেন, মারা যাচ্ছেন। আট-দশটি জেলায় বহু জায়গায় মাটির তলায় জলে আর্সেনিকের মাত্রা বিপদসীমার অনেক ওপরে। এবং আমাদের লন্ডন-হয়ে-উঠতে-থাকা কলকাতাতেও বেশ কিছু জায়গায় মানুষ পানীয় জলে আর্সেনিক খাচ্ছেন।

শুধু আর্সেনিক নয়। ভোপাল শিল্প-দুর্ঘটনায় মানুষ মরেছেন হাজার হাজার, পঙ্গু হয়েছেন কয়েক লাখ। নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা অবহেলা করতেন এমন তথ্য নেই। ভারতে পশ্চিমবঙ্গে অজস্র ছোটোবড় কারখানা ছোটোবড় ভোপাল হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছোটোবড় অজস্র দুর্ঘটনা ঘটছেও প্রতিদিন। প্রতিকারের কোনও চেষ্টা চোখে পড়ে না।

সেদিন জাপানে ফুকুশিমার যে পরমাণু চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটল তার চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক চুল্লি আমাদের দেশে রয়েছে। ফুকুশিমার পরে অন্যান্য দেশ যখন নতুন পরমাণু চুল্লি বসানো বন্ধ করছে, এমনকি পুরোনো চুল্লিগুলো বাতিল করার চেষ্টা করছে, আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তির চুল্লি বসানোর জন্য কাজ চলছে পুরোদমে। মহারাষ্ট্রের জৈতাপুর, তামিলনাড়ুর কোদানকুলম, আর পশ্চিমবঙ্গের হরিপুর। যে বিদেশি কোম্পানিগুলো চুল্লি বসাচ্ছে তারা জানে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশি, আর সেক্ষেত্রে আইনমতো ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে তারা ফতুর হয়ে যাবে। তাই ভারত সরকার নতুন আইন করলেন যে বিদেশি চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে বিদেশি সংস্থার তেমন দায় থাকবে না। অর্থাৎ তারা এদেশে ফুকুশিমা ঘটালে আমরা বিনিপয়সার গিনিপিগ হতে রাজি আছি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে স্বাস্থ্য নিয়ে রোগ নিয়ে ওষুধ নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু দু'একটা কথা কি এইসব বিষয় নিয়েও বলতে হবে না? আমাদের নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের স্বাস্থ্যের স্বার্থে জরুরি দু-চার কথা? ❑

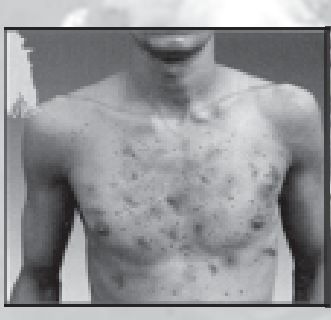

শরীর

ঘাড়ের ব্যথা

আমাদের নাগরিক কবিয়াল গেয়েছেন - 'চল্লিশ পেরোলেই চালশে।' তবে ছন্দ আর সুর একটু চুরি করে অনায়াসে লেখাই যায় - 'এ ব্যথা কী যে ব্যথা, বোঝে কি ডাক্তারে / তিরিশে পা দিতেই, মরেছি ঘাড় ধরে।' সেই ঘাড়ের ব্যথার কারণ ও নিবারণ নিয়ে **লিখেছেন ডা. সুব্রত গোস্বামী।**

বিবর্তন এর পথে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের আদিম পূর্ব মানুষরা একদিন দুপায়ে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালেন। সেদিন থেকেই মানুষ অন্য সব প্রাণিদের থেকে অনেক দূর দেখতে পেল। ঝলসানো মাংসে যে প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গেল, তা আত্তীকৃত করেই নাকি মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে। ফলে শরীরের তুলনায় অনেক গুরুভার মস্তিষ্ককে সোজা রাখবার দায় পড়ল আমাদের শিরদাঁড়ার ওপরের দিকে সাতটি গ্রীবা অঞ্চলের কশেরুকার ওপর। মস্তিষ্ক থেকে নেমে আসা সুষুম্নাকাণ্ড সুরক্ষিত থাকে এই মেরুদণ্ডের ভিতর। প্রতি খণ্ড কশেরুকা থেকে বেরিয়ে আসে গাছের শিকড় এর মত জোড়ায় জোড়ায় স্নায়ুর গোছা। চারদিক থেকে ঘিরে থাকা ফিতের মত মাংসপেশির ছন্দবদ্ধ সঞ্চালনায় অস্থি-সন্ধি (Facet Joint) ও অস্থিরজ্জুর (Ligament) সাহায্যে শির থাকলো উন্নত। এইসব কুশীলবের ছন্দের কোন ব্যঘাত ঘটলেই শুরু হয় গ্রীবাদেশের পীড়া বা চলতি কথায় 'ঘাড়ে ব্যাথা'।

বেশ কিছুদিন ধরেই ঘাড়ে একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো অভীকবাবুর। পেশায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সেদিন আচমকা বাড়িতে ফিরেই তীব্র যন্ত্রণা - সাথে ডান হাতের কনুই অবধি বিদ্যুৎ প্রবাহ! গরম সেঁক, মলম - কিছুতেই আরাম মেলেনা। শুলে না বসলে লাভ হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। পাড়ার বিশু ডাক্তার এলেন, কড়া ব্যথা আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাত কাটল কোনও রকমে। পরদিন শহরের বড় নিউরোসার্জন ভাবলেশহীন গলায় বললেন -'সার্ভিকাল ডিস্ক প্রোলাপ্স'!

ঘাড়ে ব্যথা হয় কাদের?

ক) কাজ করবার সময় বসবার ভঙ্গি বেঠিক হলে -ঘাড় ঝুঁকে বা উঁচিয়ে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপ-কম্পিউটার, লেখা-লেখি, পরীক্ষার খাতা দেখা, রান্না করা, ছবি আঁকা, নকশা আঁকা এ সব কাজ করেন।

খ) ঘুমোবার ভঙ্গি ঠিক না হলে - অনেক খুব উঁচু বালিশে মাথা রেখে ঘুমান, অনেকে আবার খুব পাতলা বালিশ ব্যবহার করেন, কেউ রাতে টিভি দেখতে দেখতে সোফাতেই বেঁকেচুরে শুয়ে পড়েন, কেউ কেউ আবার উপুড় হয়ে ঘুমান - এ সব হল বদ-অভ্যেস।

গ) পথ দুর্ঘটনার পর - আচমকা গলা আর মাথা একসাথে চাবুকের মত আন্দোলিত হতে পারে (Whip-lash), খুব তাড়াতাড়ি। জখম হতে পারে কশেরুকার অস্থিসন্ধি, অস্থিবন্ধনী (Ligament), মাংসপেশি বা স্নায়ুতন্তু।

ঘ) আচমকা আঘাত বা পড়ে গেলে - খেলাধুলার সময় এ ধরনের আঘাত লাগে। অধিকাংশ সময়ই মাংসপেশির আঘাত লাগে। তবে সুষুম্নাকাণ্ডেও মারাত্মক চোট লাগতে পারে।

ঙ)সেলুনে আনাড়ি লোকের হাতে ম্যাসেজ - চুল কাটবার পর আনাড়ি লোকের হাতে ঘাড় ম্যাসেজ, ঘাড় 'ফোটানো'র ফলে কত জনের যে স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাত হয়েছে আচমকা!

চ) মেরুদণ্ডের ক্ষয় রোগ (Spondylosis) - যদিও এটি বয়স্কদের রোগ (৭০ বছরের বেশি বয়সীদের ৭০-১০০ শতাংশের), তবুও কম বয়সেও এই রোগ দেখা যায় (৩০ বছরের বেশি বয়সীদের ৫-১৫ শতাংশের)। অনেক সময় ছোট ছোট হাড়ের কুচি (Osteophyte) তৈরি হয়ে স্নায়ুতে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। দুটি কশেরুকা খণ্ডের মাঝে থাকা চাকতির ভেতর থেকে জেলির মত অংশ বেরিয়ে স্নায়ুর ওপর প্রদাহ ঘটায়, যাকে মেরুদণ্ড চাকতির স্থলন (Disc prolapse) বলে। হঠাৎ তীব্র ব্যথা, হাতে বিদ্যুতের ঝলক, এসব হতে পারে। কখনও আবার ঘাড় একদিকে বেঁকে, মাংসপেশি শক্ত হয়ে তালাবন্ধ (Locked) হবার মত দশা হয়।

ছ) সংক্রামক ব্যাধি - আমাদের দেশে টিবি রোগের প্রকোপ নেহাত কম নয়। মস্তিষ্ক-আবরণীর টিবি রোগে ঘাড়ে ব্যথা হয়। এছাড়া মস্তিষ্কের অনেক সংক্রমণেই ঘাড়ে ব্যথাই হল প্রাথমিক লক্ষণ।

জ) কর্কট রোগে - অনেক সময় কর্কট (Cancer) রোগ শিরদাঁড়ায় ছড়ায় (বিশেষত মুখ, ফুসফুস ইত্যাদি ক্ষেত্রে)। কখন আবার সুষুম্নাকাণ্ডের অথবা ঐ অঞ্চলের টিউমার হতেও পারে।

ঝ) অস্থি নরম হয়ে পড়লে (Osteoporosis) - বয়সকালে হাড়ে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে, হাঁপানি বা অন্য রোগের জন্য অতিরিক্ত স্টেরয়েড সেবন করলে মেরুদণ্ডের হাড় নরম হয়ে যায়, অল্প আঘাতেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

ঞ) উচ্চ রক্তচাপে ঘাড় ও মাথার পেছন দিকে একটানা ব্যথা হতে থাকে।

ট) যে সকল কর্মীরা একটানা মাথা ঝুঁকে কাজ করে যান দিনের পর দিন যেমন বিড়ি-শ্রমিক, চা-শ্রমিক, ছবি আঁকা, কম্পিউটারে নক্শা করা, জরির কাজ, কাঁথা সেলাই, দরজির কাজ, ধান রোয়ার কাজ, কুমোরশালার কাজ, এমন অনেক বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ।

ঠ) যাঁরা মোট বওয়ার কাজ করেন।

ড) অনেক সময় এমনকি চিকিৎসকদেরও যেমন শল্য-চিকিৎসক, প্যাথলজি-বিশেষজ্ঞ, চক্ষু-চিকিৎসক, নাক-কান-গলার চিকিৎসক - বিশেষত যাঁরা মাইক্রোস্কোপ, ল্যাপারোস্কোপ, ইত্যাদি যন্ত্রে একটানা মাথা ঝুঁকিয়ে বা একদিকে তাকিয়ে কাজ করেন। বছরে দু-চার সপ্তাহ এঁরা তীব্র ঘাড়ের ব্যথায় কষ্ট পান।

কি করলে ধরা পড়ে এই রোগ?

প্রধান পরীক্ষা হল এক্সরে, তবে অনেক সময় ব্যথা না থাকলেও এক্সরেতে সমস্যা দেখা যায়, আবার এক্সরে স্বাভাবিক হলেও ব্যথা হতে পারে।

অনেক সময় এম আর আই স্ক্যান, এন সি ভি, ই এম জি এসব পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। রক্তে শর্করা, হিমোগ্লোবিন, ই এস আর এসব পরীক্ষা করতে হতে পারে। তবে কোন ব্যথা-বিশেষজ্ঞ, স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ বা অস্থি-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার।

কি করলে এই রোগের কবল থেকে দূরে থাকা যায়?

ক) নিয়মিত শরীর চর্চা করা। যেমন, ঠিক মত গা গরম না করে খেলতে গেলে বেশি চোট লাগে, তেমনই রোজ নিয়ম করে অন্তত কুড়ি মিনিট ব্যায়াম করলে এসব রোগ থেকে অনেক দূরে থাকা যায়।

মাথা সোজা রেখে হাতের চেটো দিয়ে মাথার

ঘাড়ের ব্যায়াম

একদিকে শক্ত করে ঠেলতে হবে, মাথা শক্ত রাখতে হবে, যাতে অন্যদিকে হেলে না যায়। এমন করে মাথার ডানদিক, বাঁদিক, চিবুক আর তার সাথে দুহাত জোড়া করে কপালের পেছনে ও সামনে ঠেলার মতো চাপ দিতে হবে। প্রতিবার এক থেকে দশ অবধি গুনতে হবে।

খ) কম্পিউটারে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সঠিক ভঙ্গীতে বসবেন। পিঠ চেয়ারে লাগিয়ে বসবেন সোজা হয়ে (পিছনে একটা ছোট বালিশ জাতীয় কিছু রাখতে পারেন)। চোখের মনির থেকে কম উচ্চতায় যেন কম্পিউটারের পর্দার ওপর দিকটা থাকে।

কম্পিউটার টেবিলে বসবার সঠিক ভঙ্গি

মোটামুটি এক হাত বা আঠার ইঞ্চি দূরে বসা উচিৎ। কী-বোর্ডে টাইপ করার সময় যেন কনুই শরীরের সাথে লেগে থাকে। অন্তত হাঁটুর উচ্চতা বিশিষ্ট চেয়ারে বসা উচিৎ, প্রতি কুড়ি মিনিট পর কুড়ি ফুট দূরে কুড়ি সেকেন্ডের জন্য তাকান। আধ ঘন্টা পরপর এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁড়ান।

গ) নিয়মিত বিশ্রাম নেবেন, অন্তত ছঘন্টা ঘুমোবেন, শোবার সময় বালিশ এমন নেবেন যাতে

সঠিক ঘুমোবার ভঙ্গি

মাথা থেকে পা মোটামুটি শরীরের মধ্যরেখা বরাবর থাকে। বেশি উঁচু বা নিচু বালিশ নেবেন না।

ঘ) ট্রেনে, বাসে বা প্লেনে যাঁরা ঘনঘন চলাফেরা করেন, তাঁরা ঘাড়ের পেছনে উপযুক্ত সাপোর্ট রাখবেন।

ঙ) পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

চ) একটানা কাজের সময়, অন্তত কুড়ি সেকেন্ডের জন্য, কুড়ি মিনিট পর পর কুড়ি ফুট দূরে তাকান।

কি চিকিৎসা দরকার?

অধিকাংশ সময়েই বিশ্রাম, সাধারণ ব্যথার ওষুধ (Analgesic), গরম সেঁক, দুশ্চিন্তা বা অবসাদ দূর করে এমন ওষুধ, মাংসপেশি শিথিল করবার ওষুধেই (Muscle relaxant) ৯০ শতাংশ ব্যথা সেরে যায়।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শে হাল্কা ম্যাসেজ, টেনস (TENS), শর্টওয়েভ সেঁক করা যেতে পারে।

তবে আধুনিকতম এবং সাম্প্রতিকতম চিকিৎসা হল 'ইন্টারভেনশনাল পেইন ম্যানেজমেন্ট'। কোন ছুরির সাহায্য ছাড়াই, আধুনিক ইমেজ ইন্টেন্সিফায়ার (Image Intensifier) যন্ত্রে লোকাল আনেস্থেসিয়া

ইন্টারভেনশনাল পেইন ম্যানেজমেন্ট

প্রয়োগে, পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশেও ব্যথা-বিশেষজ্ঞরা (Algologist) স্নায়ুর চাপ মুক্ত করে, বা বেতার তরঙ্গের (Radio frequency) মাধ্যমে বেদনা বহনকারী স্নায়ুর চিকিৎসা করে এই রোগ নিরাময় করছেন। ফলে অধিকাংশ সময়েই অপারেশন এড়ানো সম্ভব হচ্ছে।

যদি ঘাড়ের ব্যথার সাথে হাতের জোর কমে যায়, মল মুত্র ত্যাগে সমস্যা থাকে, ওজন কমতে থাকে, ৬ সপ্তাহের বেশি সময়েও ব্যথা না কমে, তাহলে চিন্তার ব্যাপার, নিউরোসার্জনের কাছে যেতে হবে। অপারেশান লাগাতে পারে! ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. সুব্রত গোস্বামী, এম বি বি এস, এফ আই পি পি, ব্যথা বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে 'পেইন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট'-এর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

শরীর

দাঁতে ব্যথার চিকিৎসা

সাধারণ দাঁতে ব্যথার চিকিৎসা গল্পচ্ছলে পাঠককে অসাধারণভাবে শিখিয়ে দিচ্ছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা রায়**।

ঘড়িতে দশটা বাজতে দশ। সূর্যের তেজ বেশ কড়া হয়ে উঠেছে। রন্টাই, টুবলু-পিয়ালিরা সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে যাবার জন্য মামার ঘরের সামনে ঘুরঘুর করে শেষে যে যার মত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মামার দরজা খোলেনি। মামা কখনও এত বেলা অবধি ঘুমোন না। বরং সাতসকালে উঠে ভাগ্নে ভাগ্নীদের নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাওয়াই তাঁর অভ্যাস। আর মামা মানেই ক্যামেরায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি তোলা, আর গল্প। কি হল তাঁর এবার?

অথচ এমনটা ঘটবে তা আগে আঁচই করা যায় নি। বরং বাড়িতে হুলুস্থুল, সকাল থেকেই সাজো সাজো রব, মা ফর্দ করে বাবাকে পাঠিয়েছেন বাজারে। বঙ্কা এসেছে, মানে চিকেন চলবে না। একদম খাসি। সে ডাক্তার যতই ট্রাইগ্লিসারাইডের ভয় দেখান, দিদির বাড়ি মানেই বঙ্কামামার বাৎসরিক ছুটির দিন। ছুটি ডাক্তারদের ধমকধামকেরও।

বাবা আবার আড় মাছ এনেছেন। বঙ্কামামা নাকি ভালোবাসে, আসলে শালাবাবুর সুবাদে বউ-এর গুড বুকে থাকার এই প্রচেষ্টা বাবা প্রতিবারই করেন। হারুর দোকান থেকে এসেছে লাল দই, রাজভোগ। কিন্তু যার জন্য এত কিছু, সে তো অ্যাবনরম্যালি বিহেভ করছে।

'বঙ্কা, এই বঙ্কা।' মা ধৈর্য হারিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভেতর থেকে একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ ভেসে এল। সশব্দে দরজা খুললেন মামা, মা তো আঁতকে উঠলেন। মামাকে যে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। মুখটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মায়ের মুখ কালো, এত রান্নাবাড়ি, ভাই খাবে, কিন্তু তার যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে এসব ফ্রিজে তুলে রাখাই দেখছি ভালো। বাবা এসে শালাবাবুর নাড়িটা দেখলেন—''এতো বেশ জ্বর আছে যে তোর। তা, রাতে একবার ডাকিসনি কেন? চল, মুখ হাত ধুয়ে অল্প কিছু খেয়ে নিবি।'' বাবা ফোনে ডা. সাধুখাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বসে গেলেন।

রন্টাই-এর হাসি পাচ্ছিল। ভাগ্যিস বাজার করার পর মামা দরজা খুলেছে, যা-সব আনা হয়েছে, সেগুলো তো আর ফেরত যাবে না। মামা খাক আর না খাক, তাদের ভাগ্যে তো শিকে ছিঁড়বেই।

গাড়িটা বের করে বাবা বঙ্কা মামাকে নিয়ে গেলেন ডা. সাধুখাঁর চেম্বারে। এগারোটায় ফিরলেন। সঙ্গে এক ব্যাগ ওষুধপত্র। গাড়ি থেকে নামতেই পিয়ালি মামাকে হ্যান্ডসেক করে বলল, ''লাঞ্চটা আজ তাহলে ওগুলো দিয়েই সারো।''

পিয়ালিকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এলেন মামা। ফোলাটা যেন একটু কম লাগছে। বললেন, ''আমায় নিয়ে অত চিন্তা করিস নি, কি আর এনেছে তোর বাবা! ওই তো দুটো খাসির ঠ্যাঙ, আর আড় মাছ। ওগুলো খেলেই আমার ব্যথা কমে যেত, ওষুধগুলো দিয়েছে তো ওগুলো হজমের জন্য। আসলে গণ্ডোগোলটা কাল আমিই করেছি, আজ ভালো মন্দ খাব বলে কাল রাতে খুব তাড়াতাড়ি দাঁতের ব্যথা কমানোর জন্য গরম সেঁক লাগিয়েছিলাম কষে। ডাক্তারবাবু বললেন, ওর জন্যই নাকি ফোলা বেড়েছে, ফোলার ওপর কখনও গরম দিতে নেই। আর কখনও ভুলব, বাপরে।''

ওষুধের ব্যাগ খুলল ছোটো ডাক্তার, অর্থাৎ আমাদের রুন্টাই। দেখি কি দিয়েছে? প্রেসক্রিপশনে দেখা গেল, সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম দিনে দুটো করে পাঁচদিন, টিনিডাজোল ৫০০ মিলিগ্রাম দিনে দুটো করে পাঁচদিন, আর একটা ব্যথার ওষুধ অ্যাসিক্লোফেনাক আর প্যারাসিটামলের মিশ্রণ দিনে দুটো করে তিনদিন। এক্স-রে করতে বলেছেন ডাক্তারবাবু, ব্যথা-ফোলা কমলে দাঁত তুলে ভেতরের ঘা পরিষ্কার করে দেবেন।

পিয়ালিটা আবার ওর কাকিমার যখন দাঁতে ব্যথা হয়েছিল তখনকার একটু পুরানো প্রেসক্রিপশন জোগাড় করে এনেছে। রন্টাই -এর হাতে দিল। তাতে আবার বড়ো বড়ো করে বাংলায় লেখা আছে, গরম জলে নুন দিয়ে কুলকুচি করুন। রন্টাই একটু ঘাবড়ে গেল, ''এটা কি মামা? এটা কেন লেখা হয়েছে?''

মামা বললেন, ''পিয়ালির কাকিমার দাঁতে পোকা মানে কেরিজের ব্যথা হয়েছিল, ফোলা বা পুঁজ ছিল না। ওতে গরম জলে নুন দিয়ে কুলি করলে আরাম হয়। আর আমার ক্ষেত্রে যেহেতু পুঁজ ছিল, তাই ওতে ফোলা বাড়বে।''

ছোটো ডাক্তার এই প্রেসক্রিপশনটাও চেক করল। এখানে আবার অন্য ওষুধ। এখানে অ্যামক্সিসিলিন ২৫০ মিলিগ্রাম দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন তিনবার করে ৫ দিন। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে মেট্রোনিডাজোল ৪০০ মিলিগ্রাম, এটাও দিনে তিনবার ৫ দিন, ব্যথার জন্য আইবুপ্রোফেন ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার, আর অ্যাসিডিটি কমাতে র‍্যানিটিডিন ১৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার করে পাঁচদিন।

রন্টাইয়ের কৌতুহলটা একটু বেশি। ও মামাকে বলল, ''আচ্ছা, এই দু'রকম ওষুধের তফাৎটা কি?'' মামা বললেন, ''দুটো প্রেসক্রিপশনেই প্রথম দুটো জীবাণু মারার ওষুধ, মুখের মধ্যে যে জীবাণুগুলো বসবাস করে, তাদের মেরে দেয়। আর ব্যথার ওষুধ ব্যথা কমায়। তবে এখানে একটা কথা আছে। সেটা হল আমাকে যে ব্যথার ওষুধটা দেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়ে। আজকাল বাজারে অজস্র ওষুধ পাওয়া যায়, যাকে তোরা হাঁসজারু বা হাতিমি বলতে পারিস, মানে ঐ হাঁসের গলা আর সজারুর ল্যাজ জুড়ে দেওয়া আর কি? বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি তাদের ইচ্ছেমত এরকম কম্বিনেশন বানায় আর ডাক্তারদের ভালো ভালো উপহার দিয়ে সেগুলো বাজারে বিক্রি করায়। এগুলো খারাপ ওষুধ, ব্যবহার করা উচিত নয়। অ্যাসিক্লোফেনাক ও প্যারাসিটামলের কম্বিনেশন এমনই একটি ওষুধ। বরং পিয়ালির কাকিমাকে যে ডাক্তারবাবু দেখেছেন, তিনি যে ব্যথার ওষুধ দিয়েছেন, মানে আইবুপ্রোফেন - ওটা যুক্তিসঙ্গত ওষুধ। আলাদা করে প্যারাসিটামলও দেওয়া যায়। ওটা ৫০০ মিলিগ্রামের বড়ি , বড়োরা দিনে ৪ বার খেতে পারে। আর ছোটরা ২৫০ মিগ্রার বড়ি খাবে। তুই ডাইক্লোফেন্যাকও খেতে পারিস, দিনে তিনবার করে। আর শোন, যদি ডাক্তারের কাছে বেশি না যেতে চাস, তাহলে মামার বলা একটা কথা ভালো করে মনে রাখবি, সেটা হ'ল, প্রতিদিন সকালে ছাড়াও রাতে শোওয়ার আগে ব্রাশ ও পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজবি। শুধু এইটুকুই, তোকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচাবে।''

''মামা, তুমি কেন ডাক্তার হলে না?'' - রন্টাইয়ের দু'চোখে এক অবাক পৃথিবী।

''আরে বাবা, ডাক্তাররা ছুটিই পায় না, জীবনে ওদের কোনও আনন্দ নেই, বেড়াতে যায় না, ভালো করে খেতেও সময় পায় না। দে, দে ব্যাগটা আগে দে, ভালো করে মাংসটা সাঁটাই, তারপর জীবাণুদের ধরে ধরে মারব, মারতে গেলে শক্তি চাই, তাই না?'' ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা রায়, বি ডি এস, ডেন্টাল সার্জন। নিজস্ব প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবি মানুষের নিজস্ব এক ক্লিনিকে চিকিৎসা করেন। এছাড়া অতি সাবলীল বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে লেখেন নানা পত্রিকায়, একটি ছোটদের বিজ্ঞানপত্রিকা চালান। তদুপরি তিনি সমস্ত ধরনের সহিত্যের এক তন্নিষ্ঠ পাঠকও বটে।

শরীর

কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা

জলাতঙ্ক রোগ হলে কেউ বাঁচে না অথচ সময়ে পদক্ষেপ নিলে এ রোগে মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব। রাস্তায় ঘাটে বাড়িতে এত যে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই সম্ভাব্য মৃত্যুদূত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা যদি সামান্য কয়েকটা তথ্য মাথায় রাখি তাহলে জলাতঙ্ককে আটকানো যায়— **লিখছেন ডা. সুমিত দাশ**

যেহেতু আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ জলাতঙ্ক রোগ কুকুরের কামড় থেকে হয়, তাই কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তবে রোগবাহী অন্যান্য প্রাণী, যেমন শেয়াল, বেজি, বিড়াল, কাঠবিড়াল, নেকড়ে ইত্যাদির কামড়ের চিকিৎসা একই পদ্ধতিতে হয়।

চিকিৎসাকে দু ভাগে ভাগ করা যায় —

(ক) কামড়ের জায়গায় চিকিৎসা

(খ) টিকাকরণ বা জলাতঙ্করোধক ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন

কামড়ের জায়গার চিকিৎসা : জল ও সাবান দিয়ে

- **কামড়ের জায়গা জল ও সাবান দিয়ে ১৫ মিনিট ভালো করে ধুতে হবে।**
- **অ্যালকোহল বা পোভিডন আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। স্যাভলন বা ডেটল ব্যবহার করবেন না। কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে পোড়াবেন না।**

১৫ মিনিট ভালো করে ধুতে হবে। সাবান না পেলে, শুধু জল দিয়েই ভালো করে ধুতে হবে। প্রবহমান জলধারা (যেমন ট্যাপ ওয়াটার) **হলে ভালো হয়। ক্ষত গভীর হলে, ধুলো-ময়লা ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে কামড়ের জায়গার মরা চামড়া কেটে ফেলতে হবে। এর পর কামড়ানোর জায়গাটা অ্যালকোহল (৪০০-৭০০ মি.লি./লিটার) বা পোভিডন আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। স্যাভলন বা ডেটল এখন ব্যবহার করা হয় না। কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে পোড়ানোও বন্ধ করা হয়েছে, চামড়ায় বিশ্রী দাগ হয়ে যায় বলে। ক্ষতের জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বা সেলাই করা চলবে না। খুব দরকার হলে ২৪-৪৮ ঘন্টা বাদে ন্যূনতম সংখ্যায় সেলাই করতে হবে তাও অ্যান্টি র‍্যাবিস সিরাম কামড়ানোর জায়গায় দিয়ে। এমনিতেও কামড়ানোর জায়গায় অ্যান্টি র‍্যাবিস সিরাম দিতে পারলে খুব ভালো হয়। টিটেনাস ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক চালু করতে হবে।**

টিকাকরণ বা জলাতঙ্করোধক ইঞ্জেকশন :

(১) স্নায়ুকোষকলাতে তৈরি টিকা (Nervous Tissue Vaccine বা NTV) -এই টিকার নাম সেম্পল টিকা (Semple Vaccine) । এই টিকার পার্শ্বক্রিয়া অনেক বেশি, তাই দাম কম হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এই টিকার ব্যবহার প্রায় হয় না। ভারত সরকার ২০০৪ সাল থেকে এই টিকার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে।

(২) হাঁসের ভ্রূণের কোষে তৈরি টিকা (Duck Embryo Vaccine বা DEV) : যাদের হাঁসের ডিমে অ্যালার্জি আছে, তাদের যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে এই টিকাকরণ করা উচিত নয়।

(৩) কোষ থেকে তৈরি টিকা (Cell Culture Vaccine) : এই টিকা খুব শক্তিশালী এবং এর পার্শ্বক্রিয়া খুব কম। বর্তমানে দু'রকম কোষ থেকে তৈরি টিকা পাওয়া যায়।

(ক) মানুষের ডিপ্লয়েড কোষে তৈরি টিকা (Human Diploid Cell Vaccine বা HDCV) ।

(খ) 'দ্বিতীয় প্রজন্ম'-এর কোষে তৈরি টিকা (Second Generation Tissue Culture Vaccine) এই টিকা তৈরিতে মানুষ ছাড়া অন্য জন্তুর কোষ-কলা ব্যবহার হয়। যেমন গরুর ভ্রূণের কিডনি, মুরগির ভ্রূণ, কুকুরের কিডনি ইত্যাদি। এই টিকার খরচ বেশ কম, বিশেষত মানুষের কোষ-কলায় তৈরি টিকার তুলনায়। তাছাড়া এই টিকার পার্শ্বক্রিয়াও খুব কম। তাই বর্তমানে এই ধরনের টিকার ব্যবহার খুবই বেশি।

ভারতবর্ষে HDCV (Human Diploid Cell Vaccine), PCEC (Purified Chick Embryo Vaccine) এবং PDEV (Purified Duck Embryo Vaccine) পাওয়া যায়।

যেভাবে কুকুরের শরীরে রেবিস ভাইরাস ছড়ায়

ইঞ্জেকশন দেওয়ার নিয়ম: ইঞ্জেকশন দু'ভাবে দেওয়া যায়— (ক) পেশিতে ইঞ্জেকশন (খ) চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন।

(ক) পেশিতে ইঞ্জেকশন : ১ মি.লি. করে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রথম দিনটাকে '০' ধরলে মোট ৬ টি ডোজ হবে— ০, ৩, ৭, ১৪, ৩০ (বা ২৮) তম দিনে, তার পর ৯০তম দিনে আর একটা বুস্টার ডোজ।

ইঞ্জেকশন দিতে হবে বাহুর ডেল্টয়েড মাংসপেশিতে। শিশুদের ক্ষেত্রে জঙ্ঘার সামনের বাইরের (Anterolateral) দিকে এই ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। নিতম্বে এই টিকা দেওয়া উচিত নয়, কেননা নিতম্বে জমে থাকা চর্বির পরিমাণ বেশি তাই অনেকক্ষেত্রে ওষুধ রক্তে ঠিক মতো পৌঁছায় না। ৩ বছরের মধ্যে কখনও এই ইঞ্জেকশন ৬টি নেওয়া হয়ে থাকলে প্রথম ও তৃতীয় দিনে মোট দুটো ইঞ্জেকশন দিলেই চলবে। তবে কামড় গুরুতর হলে সপ্তম দিনে আর একটা ডোজ নিতে হবে।

ইঞ্জেকশন শুরু করা উচিত কামড়ানোর প্রথম দিনেই। কিন্তু শুরু করতে দেরি হলেও কামড়ানোর পরে ইঞ্জেকশন দিতেই হবে।

এই ইঞ্জেকশন দেওয়ার আর একটা সংক্ষিপ্ত সূচী

রয়েছে। প্রথম দিন দু'টি ইঞ্জেকশন ডান ও বাম ডেল্টয়েড পেশিতে, তার পর সপ্তম দিনে একটি ও ২১তম দিনে আর একটি। এই ভাবে ইঞ্জেকশনও খুবই কার্যকারী, বিশেষ করে যেখানে অ্যান্টির‍্যাবিস সিরাম দেওয়ার সুযোগ নেই।

৮ টি জায়গার চামড়ায় ইঞ্জেকশনে খরচ প্রায় ৭০ শতাংশ কমিয়ে আনা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পদ্ধতি অনুমোদনও করেছে। কিন্তু কোম্পানিগুলি লাভ কমে যাওয়ার ফলে এই মাত্রার অ্যাম্পুল তৈরি করে না। সরকারি পদক্ষেপও সুদূর পরাহত।

(খ) চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন : দেখা গিয়েছে চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন একই ভাবে কার্যকারী, দেখে নেওয়া যাক এর নিয়মকানুন।

দুটি জায়গার চামড়ায় ইঞ্জেকশন: সাধারণত PVRV (Purified Vero Cell Vaccine), PCECV (Purified Chick Embryo Cell Vaccine) এবং PDEV (Purified Duck Embryo Vaccine) এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। পেশিতে যে পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করা হয় চামড়ার মধ্যে তার ৫ ভাগের ১ ভাগ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ পেশিতে যদি ০.৫ মি.লি. ব্যবহৃত হয় তা হলে চামড়ায় ০.১ মি.লি. দিতে হবে। দু'বাহুর ডেল্টয়েড পেশির ওপরের চামড়ায় দেওয়া হয় - ০, ৩, ৭তম দিনে, এবং ২৮ ও ৯০তম দিনে একটি মাত্র ডেল্টয়েড পেশির ওপরের চামড়ায়।

৮-জায়গার চামড়ায় ইঞ্জেকশন: HDCV (Human Diploid Cell Vaccine) এবং PCECV (Purified Chick Embryo Cell Vaccine) টিকাকে এ ভাবে ব্যবহার করা যায়। এখানে নিয়ম হচ্ছে পেশিতে যতটা ওষুধ দেওয়া হয়, তার ১০ ভাগের একভাগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ পেশিতে ১ মি.লি. লাগালে চামড়ায় ০.১ মি.লি. লাগবে। '০' অর্থাৎ প্রথম দিনে ৮ জায়গায় - দুই ডেল্টয়েড পেশির চামড়ায়, দুই জঙ্ঘার বাইরের দিকে চামড়ায়, দুই স্ক্যাপুলার উপরের দিকে চামড়ায় (Suprascapular region), নীচের পেটের চামড়ায় দু'দিকে , সপ্তম দিনে ৪ টি জায়গায় (দুই ডেল্টয়েড ও দুই জঙ্ঘা), ২৮ ও ৯০ তম দিনে যে কোনও একটি জায়গায় দিতে হবে।

৮ টি জায়গার চামড়ায় ইঞ্জেকশনে খরচ প্রায় ৭০ শতাংশ কমিয়ে আনা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পদ্ধতি অনুমোদনও করেছে। কিন্তু কোম্পানিগুলি লাভ কমে যাওয়ার ফলে এই মাত্রার অ্যাম্পুল তৈরি করে না। সরকারি পদক্ষেপও সুদূর পরাহত।

ইঞ্জেকশন শুরু করা উচিত কামড়ানোর প্রথম দিনেই। কিন্তু শুরু করতে দেরি হলেও কামড়ানোর পরে ইঞ্জেকশন দিতেই হবে।

অ্যান্টি র‍্যাবিস সিরাম : অ্যান্টি র‍্যাবিস সিরামে জলাতঙ্ক ভাইরাস প্রতিরোধী ইমিউনোগ্লোবিন থাকে, তাই টিকাকরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরুতে এই সিরাম দিতে পারলে, ফল আরও ভালো হয়। টিকা দিয়ে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত এই সিরাম ভাইরাস প্রতিরোধে সাহায্য করে।

এই ইমিউনো- গ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দু'করমের হয় —

- ঘোড়ার শরীরে তৈরি জলাতঙ্কের ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Equine Rabies Immunoglobulin বা ERIG)। এটা ঘোড়ার রক্তরস থেকে হয়।
- মানুষের শরীরে তৈরি জলাতঙ্কের ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Human Rabies Immunoglobulin বা HRIG)। এটা মানুষের রক্তরস থেকে তৈরি হয়।

ERIG -তে অ্যালার্জি হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই আগে থেকে অ্যালার্জিরোধী অ্যান্টিহিস্টামিনিক ইঞ্জেকশন রোগীকে দিয়ে দিলে এই সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। HRIG-তে অ্যালার্জির ঝুঁকি খুবই কম কিন্তু এর দাম বেশি।

টিকাকরণ ও জলাতঙ্ক ভাইরাস নির্জীব করার কার্যকারী অ্যান্টিবডি রক্তে তৈরি হওয়ার মধ্যে প্রায় ১০-১৪ দিন সময় লাগে। এই সময় ইমিউনোগ্লোবিউলিন এই প্রতিরোধ শক্তি জোগায়।

প্রথম টিকার ডোজের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কেজি ওজন পিছু ২০ আই.ইউ. হিসাবে HRIG ইঞ্জেকশন মাংশপেশিতে দিতে হবে। এর একটা অংশ কামড়ানোর ক্ষতের চারপাশে ইঞ্জেকশন হিসেবে দিতে হবে। এই ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়ায় একটু জ্বর এবং ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা ছাড়া সাধারণত আর কিছু হয় না। ERIG -এর ক্ষেত্রে ডোজ হচ্ছে ৪০ আই. ইউ. প্রতি কেজি।

জলাতঙ্কের টিকা কখন দিতে হবে সেই সম্বন্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা

শ্রেণি	সন্দেহজনক বা নিশ্চিত রোগগ্রস্ত এরকম পোষা বা বন্য প্রাণীর, বা এমন প্রাণী যাকে পরীক্ষা করা যাবে না তার, সঙ্গে সংস্পর্শের ধরন	সংস্পর্শের ধরন	চিকিৎসা যে ভাবে হওয়া উচিত
১.	পশুটাকে ছোঁওয়া বা খাওয়ানো, পশু দ্বারা অক্ষত চামড়ায় চাটা	ধর্তব্যযোগ্য নয় (None)	ঠিকমতো ইতিহাস পাওয়া গেলে কিছু করার দরকার নেই।
২.	না-ঢাকা চামড়ায় সামান্য কামড়, সামান্য আঁচড় (বিনা রক্তপাতে)	সামান্য (Minor)	সঙ্গে সঙ্গে টিকাকরণ শুরু করতে হবে। নজরদারির ১০ দিন পরেও যদি পশুটা সুস্থ থাকে বা ল্যাবরেটারি পরীক্ষায় যদি দেখা যায় পশুটার জলাতঙ্ক রোগ নেই, তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করা যায়।
৩.	এক বা একাধিক কামড় যা চামড়া ভেদ করেছে অথবা ক্ষতযুক্ত চামড়ায় চাটা, শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে পশুটির লালার ছোঁওয়া বা বাদুড়ের সংস্পর্শে আসা	গম্ভীর (Severe)	সঙ্গে সঙ্গে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও টিকা দুই-ই দিতে হবে। যদি ১০ দিন নজরদারির পরে পশুটি সুস্থ থাকে বা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় রোগ নেই দেখা যায় — চিকিৎসা বন্ধ করা যায়।

টিকা সংরক্ষণ : টিকাকে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করতে হবে। একবার প্রস্তুত (re-constituted) হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব এই টিকা ব্যবহার করতে হবে।

টিকাকরণ ও জলাতঙ্ক ভাইরাস নির্জীব করার কার্যকারী অ্যান্টিবডি রক্তে তৈরি হওয়ার মধ্যে প্রায় ১০-১৪ দিন সময় লাগে। এই সময় ইমিউনোগ্লোবিউলিন এই প্রতিরোধ শক্তি জোগায়।

(১) ইঁদুর, ছুঁচো ও খরগোশের কামড়ে খুব কম ক্ষেত্রেই চিকিৎসার দরকার হয়।

কুকুরের টিকাকরণ : যেহেতু কুকুরের থেকেই জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়, তাই কুকুরের টিকাকরণ করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সম্ভব। দু'ধরনের টিকা আছে।

(ক) বি.পি.এল. নিষ্ক্রিয় স্নায়ুকোষ টিকা (BPL inactivated nervous tissue vaccine) : কুকুরটিকে ৩-৪ মাস বয়সে প্রথম ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তার পর দু'মাস বাদে এবং এর পর প্রতি বছরে। কুকুরের ক্ষেত্রে ডোজ ৫ মি.লি. এবং বেড়ালের ক্ষেত্রে ৩ মি.লি.।

(খ) পরিবর্তিত জীবন্ত ভাইরাস টিকা (Modified Live Virus Vaccine) : প্রথমে ৩-৪ মাস বয়সে ৩ মি.লি. ইঞ্জেকশন। তার পর ৩ বছর অন্তর এই ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

টিকাকরণ ও জলাতঙ্ক সম্পর্কে আরও কয়েকটি জানার কথা

* জলাতঙ্ক হলে কোনও দামী ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচানো সম্ভব না। জলাতঙ্ক শুরু হলে কোন ইঞ্জেকশনই কার্যকরী নয়। মৃত্যু অনিবার্য।
* গর্ভবতী মহিলা এই টিকা নিতে পারেন। জলাতঙ্ক ভাইরাস প্ল্যাসেন্টা দিয়ে যেতে পারে না। তাই মায়ের রোগ হলেও গর্ভস্থ সন্তানের রোগ হয় না।
* ভ্যাকসিন চলাকালীন বুকের দুধ খাওয়ানো যায়। তবে কোনও কারণে মায়ের জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা দিলে শিশুকে সরিয়ে নিতে হবে।
* ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় জ্বর, সর্দি, কাশি হলে ভ্যাকসিন বন্ধ হবে না।
* জলাতঙ্ক রোগীর এঁটো খাবার ঘটনাচক্রে মুখে গেলে বা খেয়ে ফেললে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে।
* হৃদরোগ, হাঁপানি, ডায়াবেটিস থাকলেও ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে।
* এই রোগে আক্রান্ত পশুর মাংস বা দুধ ভাল করে ফুটিয়ে খাওয়া যেতে পারে। ❑

লেখক পরিচিতি: ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডি পি এম, পেশায় মনোরোগবিশেষজ্ঞ। তাঁকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন **ডা. অভিজিৎ পাল**, এম বি বি এস, এম ডি, ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

advt.

Acne, Hair Fall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

শরীর সমাজ চিকিৎসা

শিশুর আন্ত্রিক

শিশুর ডায়ারিয়ায় মুখে খাবার নুন-চিনির জলই মহৌষধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত ORS দিতে পারলে ভালো, ভাতের পাতলা ফ্যানের সঙ্গে নুন মিশিয়ে খাওয়ালেও খুব ভালো কাজ হয়। শিশুর শরীর থেকে মলের মাধ্যমে প্রচুর জল বেরিয়ে প্রবল জলাভাব না ঘটলে শিরা ফুঁড়ে ইঞ্জেকশন দেবার কোনও কারণ নেই। আর শিশুর ডায়রিয়ায় কোনও ওষুধ লাগে না, উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু বা হাতুড়েরা যে ওষুধ দেন তা বাচ্চার ক্ষতিই করে। **লিখছেন ডা. শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র।**

পৌষ্টিক তন্ত্রে জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী বা ছত্রাক) সংক্রমণ হলে আন্ত্রিক (Acute gastroenteritis) হয়। বার বার পাতলা পায়খানা (Diarrhoea) এই রোগের লক্ষণ। সঙ্গে বমি এবং অল্প জ্বরও হতে পারে। অন্ত্রের প্রদাহ (Inflammation) হয় বলে এই রোগকে আন্ত্রিক বলাই ভাল, তবু প্রধান লক্ষণ অনুযায়ী ডায়রিয়া নামেই রোগটি অধিক পরিচিত। এই রোগের আর একটি স্বল্প ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দ হল উদরাময়। শিশুরাই এই রোগে সব চেয়ে বেশি ভোগে। বার বার ডায়রিয়া হলে শিশুর অপুষ্টি হয়। আবার অপুষ্ট বাচ্চা ডায়রিয়ায় বেশি ভোগে। প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে ১৫ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়। ভারতে ডায়রিয়ার কারণে রোজ প্রায় দেড় হাজার, ঘন্টায় ৪১ জন বা প্রতি দেড় মিনিটে একটি শিশু মারা যায়। পায়খানা করার পরে, খাওয়ার আগে, খাওয়ানোর আগে, রান্না করার আগে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুলে ডায়রিয়ার জীবাণুর শরীরে ঢোকা আটকানো যায়। অবশ্য হাত ধোয়া মানে বাম হাতে জলের মগ ধরে ডান হাতে কিছুটা জল ঢেলে যেন তেন করে ডান হাত ধুয়ে ফেলা নয়। দুই হাত পরস্পরের সঙ্গে ঘষে প্রায় দু'মিনিট ধরে ভাল করে হাত ধুতে হয়।

ডায়রিয়াতে শিশু মরে কি ক'রে?

বার বার পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে নুন আর জল বেরিয়ে যায়। এতে শরীরে যে জলাভাব (Dehydration) সৃষ্টি হয় তার থেকেই শিশু মারা যায়। ডায়রিয়ার বাচ্চাকে মা উপযুক্ত খাবার ও পানীয় না দিলেই জলাভাব হবে। কম জলাভাব হলে প্রথমে বাচ্চার পেচ্ছাপ কমবে ও গাঢ় রঙের হবে, জিভ, ঠোঁট শুকোবে, বগল শুকোবে, বার বার তৃষ্ণা পাবে। তখন বাচ্চাকে পুনর্জলি দ্রবণ বা ORS (পুরো নাম Oral Rehydration Solution, আসলে নির্দিষ্ট মাত্রার নুন ও চিনির দ্রবণ) খাওয়ান। বুকে র দুধ দিন। শিরাতে স্যালাইন দেওয়ার দরকার নাই। বেশি জলাভাব হলে বাচ্চার আলসেমি (lethargy) আসবে, খেতে পারবে না, অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং শিরা দিয়ে দ্রুত স্যালাইন (Normal Saline বা Ringer's lactate) দিতে না পারলে মারা যাবে। অবশ্য যাঁরা শিরা দিয়ে স্যালাইন দিতে জানেন না তাঁরা নাক বা মুখ দিয়ে পেটের মধ্যে নল (Ryle's tube) ঢুকিয়ে ORS দিয়েও এই রকম বাচ্চাকে বাঁচাতে পারেন।

ORS জিনিসটা কী?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত পুরানো ORS-এর এক প্যাকেটে আছে দ্রাক্ষা শর্করা বা গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) ২০ গ্রাম, সাধারণ নুন (NaCl) ৩.৫ গ্রাম, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাই হাইড্রেট ($Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$) ২.৯ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) ১.৫ গ্রাম।

নতুন ORS-এর এক প্যাকেটে আছে গ্লুকোজ ১৩.৫ গ্রাম, সাধারণ নুন ২.৬ গ্রাম, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাই হাইড্রেট ২.৯ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ১.৫ গ্রাম। নতুন ORS-কে কম অভিস্রবণ ক্ষমতার পুনর্জলি দ্রবণ (low osmolarity ORS) বলা হয়।

নতুন বা পুরানো সবক্ষেত্রেই পুনর্জলি লবণের (Oral Rehydration Salt) পুরো প্যাকেটটা এক সঙ্গে এক লিটার জলে গুলতে বলা হয়। বাড়িতে এক লিটারের মাপ না থাকলে আন্দাজে জল নিতে হলে বরং এক লিটারের একটু বেশি জল নিন, তবু কম নেবেন না। প্রায়ই দেখা যায় অনেকে ORS -এর প্যাকেট থেকে অল্প কিছু লবণ গ্লাসের জলে গুলে খাচ্ছেন বা খাওয়াচ্ছেন। এটা ঠিক নয়, কারণ এভাবে তৈরি দ্রবণে লবণের মাত্রা ঠিক থাকে না।

ডায়রিয়ার সময় শরীরের লবণ ও জল বেরিয়ে যায়। ORS-সেই ঘাটতি পূরণ করে জলাভাব ও মৃত্যু থেকে শিশুকে বাঁচায়। ৬ মাসের কম বয়েসি শিশুকে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর এক গ্লাসের এক চতুর্থাংশ ORS দিন, ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়েসি শিশুকে এক চতুর্থাংশ থেকে আধ গ্লাস ORS দিতে হবে। দু'বছরের বেশি বয়েসি শিশুকে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আধ গ্লাস থেকে এক গ্লাস দিতে হয়। আরও বড় শিশু যতটা পান করতে পারে তাকে ততটাই ORS দিন। এই ভাবে ORS দিলে এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক খাবার খাওয়ালে আন্ত্রিকে আক্রান্ত বাচ্চার জলাভাব হবে না।

আর যদি কোনও বাচ্চার শরীরে কিছু জলাভাবের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাকে প্রথম চার ঘন্টায় প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার (গড়ে ৭৫ মি.লি.) ORS দিতে হয় (উদাহরণ : ১০ কেজি ওজনের বাচ্চাকে প্রথম চার ঘন্টায় ১০ x ৭৫ মিলি বা ৭৫০ মিলি ORS খাওয়াতে হবে)। ORS-এর কাজ কিন্তু ডায়রিয়া কমানো নয়, এর ব্যবহারে হয়ত ডায়রিয়া কিছুটা বাড়তেও পারে। ORS অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে এবং তার কিছুটা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলে এমনটা হতে পারে। তবে নতুন ORS -এ নুন ও চিনি কম আছে (low osmolarity) বলে এর ব্যবহারে পুরোনো ORS- এর সঙ্গে তুলনায় বাচ্চার মলের

ও বমির পরিমাণ কম হয়। তাই এতে শিশুর মা বাবার সন্তুষ্টি বেশি হয়। ORS-এর জল রুগীকে জলাভাব থেকে বাঁচায় আর গ্লুকোজ সোডিয়ামের শোষণ বাড়িয়ে দেয়। রুগী বেঁচে যায়।

এক লিটার জলে আট চামচ চিনি (ইক্ষু শর্করা বা সুক্রোজ) ও এক চামচ নুন (সোডিয়াম ক্লোরাইড) মিশিয়ে বাড়িতেই ORS তৈরি করতে পারেন। যদি জোটে তো এর সঙ্গে একটা পাতিলেবুর রস মেশাতে পারেন। ডায়ারিয়াতে মলের সঙ্গে বৃহদন্ত্র থেকে ক্ষার (বাইকার্বোনেট) বেরিয়ে যায়। পাতিলেবুর সাইট্রেট লিভারে গিয়ে বাইকর্বোনেটে জারিত হয় যা শরীরে ক্ষারের অভাব পূরণ করে। লেবুর বদলে আধচামচ খাবার সোডা (রাসায়নিক ফর্মূলা $NaHCO_3$, এ ক্ষারধর্মী) দিলেও চলে। আট চামচ চিনিতে প্রায় ৪০ গ্রাম চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) থাকে যার মধ্যে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) থাকে ২০ গ্রাম। আর এক চামচ নুনে প্রায় ৫ গ্রাম নুন থাকে। এক লিটার জলে ছয় চামচ চিনি ও এক চামচ নুনের দ্রবণ তৈরি করলে তা কম অভিস্রবণ ক্ষমতার পুনর্জলি দ্রবণ হবে। কিছুদিন আগে এক রুগীর কাছে ORS-এর ছোটো প্যাকেট দেখেছিলাম যা এক গ্লাস জলে গুলতে হয়। এর দাম কিন্তু প্রমাণ মাপের ORS-এর চার ভাগের এক ভাগ নয়, তার চেয়ে বেশি। সফট ড্রিঙ্কের মতো তৈরি ORS-এর ২৫০ মিলিলিটারের পাউচও নাকি আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি ব্যবসায়িক লাভের জন্য সৃষ্টি। কিনবেন না। সামান্য ২৫০ মি.লি. ORS -এ হবেটা কি? বাড়িতে অল্প ORS তৈরি করতে চাইলে এক গ্লাস জলে দু চামচ চিনি এবং এক চিমটে নুন (বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যে যতটা নুন উঠে, এক চামচের এক চতুর্থাংশের কাছাকাছি) মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন। আর ভাতের পাতলা ফ্যানের সঙ্গে নুন মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। এ-ও অতি উত্তম ORS। ভাতের ফ্যানে আছে স্টার্চ যা পরিপাক হয়ে ধীরে ধীরে বেরোবে গ্লুকোজ এবং তা অন্ত্রে সোডিয়ামের শোষণে সহায়তা করবে। এদিকে স্টার্চের অণুগুলি বড় (Polymer) বলে অভিস্রবণ ক্ষমতা কম। তাই স্টার্চ বেশি থাকলেও চিন্তা নাই। এই ORS -এ ডায়রিয়া বাড়বে না। প্রতি গ্লাস মাড়ে এক চিমটি নুন দিন। তাহলেই বিনামূল্যে পাওয়া যাবে দারুণ মানের Low osmolarity ORS, যা আন্ত্রিকের কারণে রোজ সহস্রাধিক ভারতীয় শিশুর মৃত্যু রুখে দিতে পারে।

ORS ছাড়া আর কি দেবেন?

ORS-এ ডায়রিয়া কমে না। তাহলে ডায়রিয়া কমবে কোন ওষুধে? ডায়রিয়া কমাতে পারে বাজারে এমন ওষুধ (Antidiarrhoeal) আছে। যেমন ধরুন লোপেরামাইড (Loperamide)। এ ওষুধ খেলেই ডায়রিয়া বন্ধ। কিন্তু খাবেন না। খেলে বিপদ হতে পারে। শরীর থেকে দূষিত মল বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। তারপর ডায়রিয়া বিনা ওষুধে নিজেই সেরে যায়। আন্ত্রিকে আক্রান্ত শিশুকে ফলের রস, গ্লুকোজ, সফট ড্রিঙ্ক দেবেন না। তাতে ডায়রিয়া বাড়তে পারে, এই সব পানীয় দ্রব্যে উপস্থিত শর্করা অন্ত্রের মধ্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে এবং তা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ফলে ডায়রিয়া বাড়ে ও দুধ বেশি না দেওয়াই ভাল। বরং দই দিতে পারেন। দইয়ের মধ্যে ল্যাকটোব্যাসিলাস নামের জীবাণু আছে যা আমাদের পক্ষে উপকারী। পানীয় জল, ডাবের জল দিতে পারেন। ডায়রিয়া হলে বাচ্চাকে চাল ও ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি ক'রে খাওয়ান। খিচুড়িতে বেশি করে ঘি বা মাখন দিলে ভাল হয়। অবশ্য তার বদলে বেশি করে সরষের তেল দিলেও হয়। বাচ্চা তেল থেকে শক্তি (ক্যালরি) পাবে। ফলের মধ্যে পাকা কলা দিতে পারেন, বাচ্চা তা থেকে পটাসিয়াম পাবে। কিন্তু আঙুর, আপেল দেবেন না। এসব ফল দিলে আঙুরের গ্লুকোজ আর আপেলের অপাচ্য তন্তু (Fiber) থেকে ডায়রিয়া বাড়তে পারে। আন্ত্রিক হলে সেদ্ধ ডিম, মাংসের স্যুপ দিতে পারেন। এসব খুব পুষ্টিকর হবে।

ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার

এবার ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলি। পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়লে তাকে বলে ডিসেন্ট্রি (Dysentery)। শিশুদের ডিসেন্ট্রি হয় সাধারণতঃ সিগেলা (Shigella) বা দু'এক ধরনের ই.কোলাই (Enteroinvasive E. coli, Enterohaemorrhagic E. coli) জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে কোলনে ঘা বা ক্ষত (Ulcer) হয় এবং তা থেকে রক্ত ঝরে। এসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। তবে যখন একটি শিশুর বারবার পাতলা জলের মত পায়খানা হয় কিন্তু তাতে রক্ত থাকে না, তখন অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই ডায়রিয়া হয় রোটা ভাইরাসের আক্রমণে। আর আমরা জানি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারে, তা ভাইরাসের উপর কার্যকর নয়।

শিশুর মল দিয়ে রক্ত পড়লে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন? সালফোনামাইড গ্রুপের কোট্রাইমোক্সাজল বা কুইনোলোন গ্রুপের ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড দেওয়া যায়। কিন্তু অত্যাধিক এবং নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে ডিসেন্ট্রির অনেক জীবাণু (বেশ কিছু সিগেলা) এখন কোট্রাইমোক্সাজল ও ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড প্রতিরোধী হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা আর ওই অ্যান্টিবায়োটিক মরে না। এজন্য অনেক ডাক্তারবাবুই আজকাল মলের সঙ্গে রক্ত পড়লেই (এমনকি না পড়লেও!) শিশুদের ওফ্লক্সাসিন ও নরফ্লক্সাসিন নামক ফ্লুরিনযুক্ত কুইনোলোন অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। কিন্তু শিশুদের উপর এই ওষুধগুলির প্রয়োগ ভারতবর্ষে (এবং বিলাত, আমেরিকাতেও) আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এই ওষুধগুলি থেকে শিশুদের তরুণাস্থির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বুদ্ধিমতি পাঠিকা প্রশ্ন করতে পারেন যে যদি কোনও সৎ চিকিৎসক নিষিদ্ধ ওষুধ না দিতে চান তাহলে তিনি কোনো শিশুর ডিসেন্ট্রির চিকিৎসা করবেন কি করে? বেশ কিছু সিগেলা আজকাল কোট্রাইমক্সাজল ও ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড প্রতিরোধী যে? শিশু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত বইয়ে (Nelson Textbook of Paediatrics, 2008) এ ব্যাপারে বলা হয়েছে বাচ্চাদের ডিসেন্ট্রিতে প্রথমে কোট্রাইমক্সাজল ও পরে ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে হবে। তাতে কাজ না হলে নরফ্লক্সাসিন জাতীয় ওষুধ (Fluroquinolones) প্রয়োগ করার কথা ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া সেফিক্সিম (Cefixime), অ্যাজিথ্রোমাইসিন (Azithromycin), সেফট্রিঅ্যাক্সোন (Ceftriaxone) ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকগুলিও সিগেলার বিরুদ্ধে ভালই কার্যকর ও শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ। আর সেফিক্সিমের সুবিধা হল এটা দুদিন দিলেই চলে (Paediatric Infectious Disease Journal 2000; 19:522-526)। নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে এদেশে ৩৮.৫ শতাংশ সিগেলার জীবাণুর নরফ্লক্সাসিন প্রতিরোধী হয়ে গেছে। কলকাতার বেলেঘাটায় অবস্থিত সংক্রামক রোগের হাসপাতাল (Infectious Disease Hospital) ও নারকেলডাঙায় অবস্থিত বিধান চন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল থেকে এক সমীক্ষায় জানা গেছে ঐ মহানগরীতে ৯৮-১০০ শতাংশ সিগেলা নরফ্লক্সাসিন প্রতিরোধী (http:\\www.cdc.ncidod.EID.vol9no11/02-0652.htm)। এদিকে অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু এবং হাতুড়ে

ভাইরাসঘটিত উদারাময়েও নরফ্লক্সাসিন বা ওফ্লক্সাসিন দিচ্ছেন! এটা অপরাধ।

ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলে রাখি। সিগেলাঘটিত ডিসেন্ট্রি অ্যান্টিবায়োটিক দিলে সারে প্রায় ছয় দিনে, না দিলে সাত দিনে। ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির একটি বিরল জটিলতা হল haemolytic uremic syndrome (HUS), এই রোগে হঠাৎ বৃক্কের (Kidney) ক্রিয়া ব্যাহত হয় (Acute renal failure, লোহিত কণিকার ভাঙনজনিত রক্তাল্পতা হয়, রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায় (Thrombocytopenia)। অ্যান্টিবায়োটিক দিলে সিগেলা ঘটিত ডিসেন্ট্রি একটু আগে সারে বটে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের পীড়নে ব্যাকটিরিয়া থেকে নিঃসৃত বিষের প্রভাবে HUS-এর মতো মারাত্মক জটিলতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সালমোনেল্লা (Salmonella) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ডায়রিয়া হলে অ্যান্টিবায়োটিক বারণ। কারণ তাতে শিশুর লাভ তো হবেই না বরং সে সালমোনেল্লার বাহক হয়ে যেতে পারে। তখন সেই শিশু ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরেও মলের মাধ্যমে পরিবেশে জীবাণুটি ছড়াবে এবং অন্য শিশুদের সংক্রমণের কারণ হবে।

তবু ডাক্তারবাবুরা কেন অ্যান্টিবায়োটিক লেখেন?

কিছুদিন আগে আমার তিন বছরের মেয়েটার ডিসেন্ট্রি হয়েছিল। প্রথম দিনেই জ্বর ১০৪ ডিগ্রী ফারেনাইট ছাড়িয়ে গেল। বার বার পটিতে বসে কিন্তু পায়খানা বেশি হয় না। মেয়ে কিছু খেতে চায় না। পায়খানা পরীক্ষায় দেখা গেল মাইক্রোস্কোপের প্রতি হাইপাওয়ার ফিল্ডে প্রচুর পূঁজের কণিকা (Pus Cell) ও লোহিত রক্ত কণিকা (RBC, red blood corpuscles)। আমি বাড়ি ছিলাম না। ফোনে বাচ্চার মা বললেন, ''মেয়েটার ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি হয়েছে। কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেব?'' আমি বললাম, ''রোসো, অন্ততঃ তিনটা বইয়ে আছে যে ডিসেন্ট্রিতে খুব জটিলতা না হলে বা অপুষ্ট বাচ্চা না হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় না (Robbins and Cotran. Pathologic Basis of Disease. 8th Ed., Forfer and Arneil's Text Book of Paediatrics, 7th Ed, and CKJ Paniker. Text Book of Microbiology)। মেয়েকে খিচুড়ি খাওয়াও।'' তারপর কি হল শুনুন। দ্বিতীয় দিন থেকে মেয়েটার জ্বর হয়নি। এক সপ্তাহ পর ডায়রিয়া বন্ধ হল। বিনা ওষুধেই মেয়েটা সেরে গেল। জনৈক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে এ গল্প শুনিয়েছিলাম। তিনি বললেন, ''মানলাম আপনার কথা। সাধারণ ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। ডিসেন্ট্রিতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক না দিলেও সেরে যায়। অ্যান্টিবায়োটিক দিলে বরং অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার জন্মের ও HUS-এর সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে রুগীকে ওষুধ না দিলে চলবে কেন? তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুগী যে অন্য ডাক্তারের কাছে চলে যাবে?'' আমি বললাম, ''বেশ, মন চাইলে ডিসেন্ট্রিতে অ্যান্টিবায়োটিক দিন। কিন্তু আমার জেলার সরকারি হাসপাতালে পোস্টিং নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমাতে শিশুদের অকারণে বা ফালতু কারণে নরফ্লক্সাসিনের মতো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তো আমি পত্রিকায় আপনার বিরুদ্ধে লিখব।'' বন্ধু অমায়িক হেসে বললেন, ''সে যত খুশী লিখুন। তাতে আমার পসার কমবে না। প্রচার বাড়বে।''

অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শিশুদের ডায়রিয়াতে নরফ্লক্সাসিন ও মেট্রোনিডাজোলের (Metronidazole) মিশ্রণ ওষুধ ব্যবহার করছেন। এটি একটি অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ। চিকিৎসাশাস্ত্রের বইগুলিতে এই মিশ্রণ ওষুধের কথা বলা নেই, এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ নেই, হয় শুধু অপব্যবহার। মেট্রোনিডাজোলের কাজটা কি? এটি একটি অ্যামিবা নাশক। সিগেলা নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে যেমন ডিসেন্ট্রি হয় তেমনি অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা নামক আণুবীক্ষণিক পরজীবী প্রাণীর সংক্রমণেও ডিসেন্ট্রি হতে পারে। সেক্ষেত্রেও মলের সঙ্গে রক্ত বের হয়। কিন্তু অত জ্বর হয় না, বরং পেটে ব্যথা হয়। পায়খানার একটা ফোঁটা মাইক্রোস্কোপে নিয়ে দেখলে জীবন্ত অ্যামিবা দেখতে পাওয়া যায়, যাদের পেটের মধ্যে লোহিত কণিকা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে রুগীকে মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজোল (Tinidazole) দিলে অ্যামিবা মরে এবং রোগ সারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি বড়দের হলেও শিশুদের প্রায় হয় না, বিশেষ করে দু'বছরের কম বয়েসী শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগ প্রায় অজানা। তাই ছোটো শিশুদের মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজোল দেওয়ার দরকার পড়ে না। মাসকয়েক আগে আমি জনৈক অতি-বিশেষজ্ঞ (Super Specialist) শিশু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখেছিলাম। তিনি একটি আড়াই বছরের বাচ্চাকে দু'দিন ধ'রে জলের মত পায়খানা আর বমির জন্য ওফ্লক্সাসিন ও টিনিডাজোলের মিশ্রণ, একটি ভিটামিন, আর বমির ওষুধ দিয়েছিলেন। রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওটা ভাইরাল ডায়রিয়া ছিল। কোনও ওষুধ দরকার ছিল না।

কিছুদিন আগে জনৈক অধ্যাপক ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। ইনি বিশেষজ্ঞ শিশু চিকিৎসক এবং কলকাতার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের শিশুবিভাগের বিভাগীয় প্রধান। আমি তাঁর ছাত্র না হলেও ছাত্রস্থানীয়। তিনি বছর তিনেকের একটি শিশুকে দু'দিনের বমি আর একদিনের পাতলা পায়খানার জন্য সেফিক্সিমি, অনডানসেট্রন, প্যারাসিটামল, আর একটি প্রোবায়োটিক দিয়েছেন। ইনি কত ভাল দেখুন। ছোটো শিশুটিকে ইনি নিষিদ্ধ ওষুধ নরফ্লক্সাসিন দেননি। বাচ্চাদের অ্যামিবায়োসিস প্রায় হয় না বলে মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজোল দেননি। কিন্তু একটা কিছু অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমে? তাই সেফিক্সিমি দিয়েছেন। আমরা কিন্তু বলব যে তারও দরকার ছিল না, কারণ বাচ্চাটার পায়খানাতে রক্ত ছিল না। আর অনডানসেট্রন সিরাপ উনি কেন দিলেন? ওটা একটা বমি বন্ধ করার ওষুধ। প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা শাস্ত্র (evidence based medicine) আন্ত্রিকে বমি নিরোধক ওষুধ দেওয়ার কথা বলে না। কারণ দিনে কয়েকবার বমি করলে বাচ্চার কোনও ক্ষতি হয় না। শুধু তাকে বারে বারে অল্প অল্প করে খাবার ও পানীয় দিতে হয়। একসঙ্গে বেশি খাওয়ালে বমি হবে। বমির ওষুধ দেওয়াটা শুধু অপ্রয়োজনীয় অর্থ নষ্টই নয় এর থেকে মারাত্মক ক্ষতিও হতে পারে। যেমন Domperidone ও Metoclopramide নামক বমির ওষুধ দুটি থেকে বাচ্চার ঘাড় ও শরীর শক্ত হয়ে যেতে পারে (Acute muscle dystonia, মস্তিষ্কের extrapyramidal system -এ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য)। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে আন্ত্রিকে বমির ওষুধ দিয়ে বাচ্চার কোনও লাভ হয় না। উল্টে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা। তাই বমির ওষুধ না দেওয়াই ভালো। American Academy of Pediatrics, AAP আন্ত্রিকে বমির ওষুধ দিতে বলেনি। Canadian Society of Pediatrics শিশুদের আন্ত্রিকে বমির ওষুধ দেওয়া চলবে না বলে মন্তব্য করেছে। ইটালিতে ষোল বছরের কম বয়েসীদের Metoclopramide দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনডানসেট্রন ওষুধটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম। তবু আন্ত্রিকে এরও সাধারণত প্রয়োজন হয় না। যদি বার বার বমি হয় (প্রতি ঘন্টায় তিন বার

বা তার বেশি এবং একনাগাড়ে) এবং তার ফলে ORS খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন এই ওষুধের একটি ডোজ দিলে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার বমি বন্ধ হয় এবং তাকে ORS খাওয়ানো সম্ভব হয়। তার ফলে বাচ্চাকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ভর্তির দরকার কমে। সরকারের, মা বাপের পয়সা বাঁচে। তাই কোনো ডাক্তার কালেভদ্রে তার চেম্বারে বা আউটডোরে ঘন ঘন বমি করছে এমন কোনও বাচ্চাকে অনডানসেট্রনের একটা ডোস দিয়ে থাকলে সেটাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে এর যথেচ্ছ প্রয়োগ যেন না হয়। আর এক দিনে কয়েকবার বা দু'তিন ধ'রে এই ওষুধ দিলে বাচ্চার বমি কমলেও ডায়রিয়া বেড়ে যায়। তাই ডাক্তারবাবুরা খুব সীমিত ক্ষেত্রে একবার মাত্র অনডানসেট্রন ওষুধটি দিলেও দিতে পারেন। আমাদের প্রফেসর বমি হলে বাচ্চাটিকে বাড়ীতে রোজ তিনবার ক'রে অনডানসেট্রন দিতে বলেছিলেন। এমনটি অবৈজ্ঞানিক।

আমার কিছু অভিজ্ঞতা

আমাদের হাসপাতালে এক বার বীরভূম থেকে আন্ত্রিকে আক্রান্ত দেড় বছরের একটি বাচ্চা এসেছিল। দুদিনের পাতলা পায়খানা ও বমির জন্য প্রথমে তাকে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে দু'দিন ধ'রে শিরায় স্যালাইন ও অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হয়। দু'দিনের বিল সাড়ে ছয় হাজার টাকা। তরপর নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ যখন রোজ আরও তিন হাজার টাকা করে লাগবে বলল, বাচ্চার মা-বাবা শিশুটিকে আমাদের হাসপাতালে এনে ভর্তি করল। আমি ইতিহাস নিয়ে জানলাম নার্সিং হোমে ভর্তির ঘন্টা দুই আগেও বাচ্চাটা পেচ্ছাব করছিল এবং নার্সিং হোমে গিয়েও মুখে খেতে পারছিল ও সক্রিয় ছিল। সুতরাং তাঁকে স্যালাইন দেওয়ার দরকার ছিল না। পায়খানাতে রক্ত ছিল না বলে অ্যান্টিবায়োটিকও দরকার ছিল না। নার্সিং হোমে শুধুমাত্র অর্থ শোষণ করার জন্যই স্যালাইন ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল। আমরা স্যালাইন, ওষুধ, ইঞ্জেকশন বন্ধ করে শুধু জিঙ্ক সিরাপ (জিঙ্ক ডায়রিয়া কিছুটা কমায় এবং ডায়রিয়াতে জিঙ্ক দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত) আর ORS দিয়েছিলাম। তিন দিনের মধ্যে সেরে গিয়ে বাচ্চা বাড়ী গেল। এ বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তির কোনও দরকার ছিল না। তবু নার্সিং হোমের শোষণ থেকে বাঁচতে আর বিনা ওষুধে ডায়রিয়া সারে মাকে এটা শেখাতে আমরা বাচ্চাটাকে ভর্তি নিয়েছিলাম।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কোনো এক গ্রামের কুড়ি দিন বয়েসের একটা বাচ্চার ডায়রিয়ার গল্প শুনুন। নার্সিং হোমে সিজারিয়ান অপারেশন করে যেদিন এই বাচ্চার জন্ম হয়, সেদিনই ডাক্তারের পরামর্শ মত ওই নার্সিং হোম থেকেই ফিডিং বোতল ও ল্যাকটোজেন (একটি বেবীফুডের বাণিজ্যিক নাম) কেনা হয়ে যায়। বটল ফিডিং থেকে হল ডায়রিয়া ও রক্তে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ও ফলশ্রুতি হিসাবে জ্বর। বাচ্চা নিস্তেজ, জলশূন্য - একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা। পর পর দুটো নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল। একদিন খিঁচুনি হল। কলকাতার সুবিখ্যাত নার্সিং হোম সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের MRI (magnetic resonace imaging) করে। কয়েকদিন শিরা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। এই নার্সিং হোমের ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা ভালই করেছিলেন। শুধু তড়িঘড়ি MRI করাটা দরকার ছিল না। সাত দিনে মোট তেতাল্লিশ হাজার ছয় শ' টাকা বিল। শেষে খরচা ঠেলতে না পেরে মা বাবা আমাদের হাসপাতালে বাচ্চাকে নিয়ে আসেন। বাচ্চার মাসি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি জেনে আশ্চর্য হলাম যে তিনি একজন সরকারি চাকুরিরতা নার্স। আমি বললাম, ''ফিডিং বোতল যে এ দেশের সবচেয়ে বড় শিশুহত্যাকারী তা কি জানেন না? বোতল দিয়ে খাওয়ালে বাচ্চাদের ডায়রিয়া অনেক বেশি হয় তা কি আপনার অজানা?'' মহিলা খুব লজ্জা পেলেন বলে মনে হল না। তিনি বললেন যে নার্সিং হোম থেকেই ফিডিং বোতল দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা ডাক্তারের পরামর্শ মতই কাজ করেছেন। আমি বললাম, ''তবে আমার কথাটাও শুনুন। দশ জন মানুষের বাচ্চাকে শেখান যে দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ফিডিং বোতল ও যে কোনও ধরনের বেবী ফুডের বিজ্ঞাপন দেওয়া বা প্রোমোট করা ভারত সরকারের আইনে নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য অপরাধ। [The Indian Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Act, 2003, Govt. of India] যাঁরা বুঝবেন একটা কাগজে তাঁদের সই করিয়ে এনে আমাকে দেখাবেন।'' ভর্তির প্রথম দিনেই ওই বাচ্চার দিদিমাকে যখন ফিডিং বোতলটা ডাস্টবিনে ফেলতে বললাম উনি তখন সেটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন। শেষে ধমক দিয়ে বেবি ফুড ও ফিডিং বোতল ডাস্টবিনে ফেলা করালাম। আমরা প্রথম দিনে বাটি ও চামচের সাহায্যে বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ালাম। দ্বিতীয় দিন থেকে বাচ্চা নিজেই পুরোদমে মায়ের স্তন চুষে দুধ খেতে লাগল ও স্যালাইন বন্ধ করা হল। দেখা গেল মায়ের স্তনে দিব্যি দুধ আসছে। মায়ের দুধ খেয়ে প্রখর গ্রীষ্মকালেও বাচ্চাটা গড়ে রোজ পাঁচবার পেচ্ছাপ করছিল। এদিকে তার মা বলতেন 'বুকে দুধ হয় না!' সাত দিন শিরা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর বাচ্চার ছুটি দেওয়া হল। বাচ্চার মাকে পই পই করে শেখানো হল যে ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়া আর কিছু লাগবে না।

ডায়রিয়া নিয়ে আমার সবচেয়ে করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুবছর আগে। আমি তখন সবে শিশুচিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে হাসপাতালে যোগ দিয়েছি। সকাল পৌনে আটটায় ইমার্জেন্সি থেকে জরুরী কল এল। দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি একজন আদিবাসী মহিলা ময়লা শাড়ি পরে বছর দুয়েকের একটি শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। মায়ের কোলে শিশুটির নড়াচড়া নেই। শিশুর ঠোঁট শুকনো; চোখ শুকনো, কোটরাগত ও নিষ্পলক। শিশুর মায়ের চোখেও জল নেই, মুখে কোনও অভিযোগ নেই। মা বাম হাতে শিশুকে ধরে আছেন, ডান হাতে একটি নরফ্লক্সাসিন ও টিনিডাজোলের শিশি। জানা গেল তাঁর এলাকারই একজন ডাক্তারবাবু ওষুধটা লিখেছেন। ডাক্তারবাবুর নামটা জিজ্ঞাসা করা বা তাঁর ব্যবস্থাপত্রটা দেখার মতো মানসিকতা আমার তখন ছিল না। দুঃখ, বিরক্তি ও রাগে নীরবে ইমার্জেন্সি ছেড়ে আসি। মনে হল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ওই ওষুধের শিশি মাকে ভুল শিক্ষা দিয়ে তাঁর শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাড়িতে কাজের লোক নাই। তাই বেশি জলাভাবগ্রস্ত বাচ্চাকে বাড়িতে ফেলে রেখে গরীব মা হয়ত ওষুধ কিনতে বাজারে গিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। ফালতু ওষুধের উপর এত বিশ্বাস হলে ORS-এর উপর বিশ্বাস কমে। ওষুধের বদলে কিছুটা নুন ও চিনির সরবৎ করে খাওয়ালে, নুন দিয়ে ফ্যান খাওয়ালে ঐ শিশুটা হয়ত মরত না। ''শিশুর ডায়রিয়াতে ওষুধ লাগে না'' একথা বড় বড় অক্ষরে লিখে প্রতিটি শিশু চিকিৎসকের চেম্বারে, নার্সিংহোমে ও হাসপাতালে ঝুলিয়ে রাখার মতো। সচেতন রুগী ও সাধারণ মানুষেরা যদি না শেখান তো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের একথা শেখাবে কে? ❑

লেখক পরিচিতি - ডা. শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র এম বি বি এস, সেনাবাহিনীর চিকিৎসকরূপে কিছু বছর কাজ করার পর বর্তমানে শিশুরোগবিদ্যায় এম ডি পাঠরত।
বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পক্ষে একজন আপোষহীন চিকিৎসক।

স্বাস্থ্য-পরিবেশ-বিজ্ঞান

ফিরে এসো চাকা

''সাইকেল? আরে ছ্যাঃ, চার চাকার গাড়ি না হাঁকাতে পারলে ইজ্জত থাকে নাকি? নিদেনপক্ষে দুচাকার ভটভট শব্দের মোটরবাইক বা স্কুটার?'' বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বলতেন - হায় সাইকেল, তোমার দিন গিয়াছে। কিন্তু সত্যিই কি সাইকেলের দিন গিয়েছে? তাহলে ইউরোপ-আমেরিকা-চিনে সাইকেলকে আলাদা করে আদর দিয়ে মাথায় তুলে ডেকে আনা হচ্ছে কেন? আমরা ভারতবাসীরাই কি কেবল বুঝতে পারছি না শরীর ঠিক রাখতে, মেদ-মধুমেহ-হৃদরোগ থেকে বাঁচতে, পরিবেশকে উদ্ধার করতে সাইকেলের জুড়ি নেই? **লিখছেন ডা. গর্গ চট্টোপাধ্যায়।**

যৌতুক ব্যাপারটা নিন্দনীয় হলেও কয়েক দশক আগে এই বাংলাতেই মধ্যবিত্ত পাত্ররা খাট-বালিশ-বাসন-নগদ ইত্যাদির সাথে একটা ভাল সাইকেলও পেত। সমাজে যৌতুকের প্রচলন কমুক না কমুক, ভয়ানকভাবে কমে গিয়েছে সাইকেলের ব্যবহার। গতরে খাটার প্রবণতা কমে গিয়েছে নানা আধুনিক সরঞ্জামের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে। সাইকেলের ব্যবহার কমেছে আজ এমন একটা সময়ে যখন ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশ মধুমেহ (ডায়াবেটিস) ও মেদজনিত হৃদরোগের মহামারীর কবলে। একই সঙ্গে প্রাইভেট মোটরগাড়ির ধোঁয়া পরিবেশ দূষণের অপরাধজগতে এক দাগি আসামী হিসেবে চিহ্নিত। এই সময়ে দাঁড়িয়ে সাইকেলের মত একটা বাহনকে জনজীবনে ব্যাপকভাবে ফিরিয়ে আনার দরকার সম্বন্ধে আমাদের ভাবা উচিত।

আর্মস্টারডমের কেন্দ্রীয় রেলস্টেশনের কাছে সাইকেল রাখার জন্য প্রায় চার তলা উঁচু লম্বা বিশাল এই সাইকেল গ্যারেজ

এই প্রসঙ্গে, প্রথমে দেখে নেওয়া যাক সাইকেলের উপকার ও সুবিধে। যেহেতু সাহেবরা যা করছে তার প্রতি আমাদের আগ্রহ অপরিসীম, শেষে আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমী বিশ্বের নানা জায়গায় সাইকেলের ব্যবহার ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, এবং তা করব আমাদের দেশের সাম্প্রতিক দু-একটি ঘটনার নিরিখে।

মানুষের শরীরে অনেকগুলি পেশি আছে, যেগুলির নিয়মিত ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আবার অব্যবহারে পেশির শক্তি ভয়ানক ভাবে কমে যায়। এটা বয়স্ক মানুষের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। সাইকেল চালানোর সময় যখন আমরা চাপ দিয়ে পেডাল ঘোরাই তখন পায়ের পেশি ব্যবহার হয়। আবার শরীরটিকে সাইকেলের ওপর সোজাভাবে ধরে রাখার জন্য পেট ও পিঠের পেশি ব্যবহৃত হয়। বিশেষত, আমাদের শিরদাঁড়ার গা ধরে নামা কিছু ছোটো ছোটো পেশি, যা অন্য কোনও ভাবে সচল করা খুবই মুশকিল, তারা এই সাইকেল চালানোর মাধ্যমে সতেজ হয়। গবেষণা করে দেখা গেছে যে সাইকেল চালিয়ে কিছু ক্ষেত্রে শরীরের হাড় হয়ে ওঠে বলশালী। জীবনযাত্রার অন্যান্য আঙ্গিকগুলি একই রকম রেখেও যদি স্রেফ নিয়মিত সাইকেল চালানো যায় তাহলে হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমতে পারে।

এটা নিশ্চয় করেই বলা যায় যে সাইকেল চালানোর ফলে শরীরে মেদ কমে। রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল বিষের মতই ভয়ানক। **সাইকেল চালানোর মাধ্যমে নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে রক্তে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমে, ফলে হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনাও কমে।** ওই মেদবৃদ্ধিকে প্রতিহত করার সাথেই বলা যায় যে সাইকেল চালিয়ে মেদহীন গঠনের মাধ্যমে শারীরিক সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটে। অনেকে বলে থাকেন, হয়তো তাঁরা অনেক খেটে-খুটে, তেল-চর্বি-মিষ্টি জাতীয় সব খাবার কম খেয়ে, ব্যায়াম করে কিছুটা ওজন কমালেন। কিন্তু, **কমিয়ে-ফেলা ওজনকে ধরে রাখা খুব কষ্টকর। ঠিক এই অবস্থায় নিয়মিত সাইকেল চালানো কমিয়ে-ফেলা ওজনকে আবার বাড়তে না দেবার এক ব্রহ্মাস্ত্র।**

নিয়মিত সাইকেল চালালে ফুসফুসে হাওয়া ভরে নেবার ক্ষমতা বাড়ে, ফলে সহজে হাঁপিয়ে পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়-যাকে বলে 'দম বাড়া'। যাঁরা সাইকেল বা অন্যান্য শরীরচর্চা করেছেন তাঁরা জানেন যে এর ফলে পেট পরিষ্কার থাকে, ফলে সকালবেলা মেজাজ থাকে ফুরফুরে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু গবেষণায় প্রকাশ যে, নিয়মিত এই ধরনের শরীরচর্চা করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বৃহদন্ত্রের ক্যানসারের ঘটনা কম, মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসারের হারও কম।

এই ধরনের শরীরচর্চা জীবনে ফুর্তিও যোগায় - চাঙ্গা করে দেয় শরীর-মনকে। সাইকেল চালানোর ফলে শরীরচর্চার ফলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে, মন থাকে আনন্দে ভরপুর। অবশ্যই হাড় ভাঙ্গা খাটুনিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সাইকেল চালানো অন্য কথা। মাত্রাতিরিক্ত কিছুই শরীরের পক্ষে ভাল নয়, সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রেও এ-নিয়ম খাটে। যেমন, খুব বেশি সাইকেল চালানোর ফলে হাঁটুর ক্ষতি হতে পারে।

তবে শুধু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতেই থেমে থাকে না সাইকেল চালানোর বরদানগুলি, এর আরও অনেক লাভজনক ফল আছে। পায়ে হাঁটা দূরত্বের চেয়ে বেশি কিন্তু অটো বা মোটরগাড়ি বা বাসে চড়ে যাওয়ার মত দূরত্ব নয়, বা গলিপথ, এমন নানা ক্ষেত্রে নানা কাজকর্ম সেরে আসতে সাইকেলের কোনও জুড়ি নেই। বোঝাই যাচ্ছে, এর ফলে যাতায়াতের খরচা কমে। আমি তো বলব, **দূষণ যেভাবে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, মোটরগাড়ি ও অন্যান্য জ্বালানি তেলে চলা ও ধোঁয়া বের করা যানবাহনকে যতটা সম্ভব বর্জন করে চলা দরকার।**

রাস্তায় মোটরগাড়ির দুর্ঘটনার ফলে প্রতি বছর অনেকে মারা যান। এছাড়াও, সাইকেল চালিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে শরীর ভাল থাকলে অসুস্থতাজনিত খরচাপাতি কমে। সাইকেলে চড়ে সবচেয়ে সরু গলিতেও ঢোকা যায়, সব জায়গাতেই পৌঁছানো হয়ে ওঠে সহজ। হুশহুশ করে দ্রুততালে পার্শ্ববর্তী সব এলাকাগুলি আমরা মোটরগাড়ি-বাস-অটোতে পার হয়ে যাই। সাইকেল চালিয়ে একটু

পশ্চিমের শহরের প্রায় প্রতিটি বড় রাস্তায় আলাদা করে দাগ দিয়ে রাখা সাইকেল চালানোর পথ, যেটা ধরে সাইকেল এগোবে

আস্তে গেলে হয়তো বা দেখতে পারি অজানা অনেককিছু, পেতে পারি নতুন বন্ধু। মোটরগাড়ির ফলে যে যে ভাবে আমাদের পরিবেশ নিয়মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, সাইকেল চালানো সেই সবকিছুকে কিছুটা হলেও প্রতিহত করতে পারে।

শহরে-গ্রামে বিশাল এলাকা থেকে, অনেক টাকা খরচা করে, অসংখ্য লোক খেদিয়ে মোটরগাড়ি চলার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সাইকেলের দাবি তার তুলনায় অতি কম। সাইকেলে নেই কোনও শব্দ-দূষণ, নেই বায়ু-দূষণ। সাইকেলে সাধারণতঃ কোনও ঠাসাঠাসি নেই - কর্মক্ষেত্রে যাওয়াটা অনেকেরই দিনের সবচেয়ে কষ্টের সময়- অচিরেই তা হয়ে উঠতে পারে আনন্দের সময়। ভিড়ের রাস্তায় সাইকেল অনেকসময় মোটরগাড়ির মতই বা তার থেকেও কম সময়ে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারে। রাস্তায় গাড়ির প্রাদুর্ভাবের ফলে একটা ঘটনা ঘটেছে- **শহরের রাস্তায় আপেক্ষিকভাবে বড়লোক মানুষের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও এক্তিয়ার বেড়ে গেছে। সাইকেল চালানো হতে পারে রাস্তার গণতান্ত্রিকীকরণের তথা মানুষের সাধারণ সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার রক্ষার লড়াই-এর একটি পদক্ষেপ।** সারা বিশ্বে নানা শহরে 'Bikes not Bombs' বা 'Critical Mass'-এর মত সংগঠন আজ দলবদ্ধ ভাবে সাইকেল চালিয়ে রাস্তার দখল জনসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেবার লড়াইতে লিপ্ত। আমরা যারা প্রায় অদৃশ্য ফুটপাথ দিয়ে কোনোক্রমে হেঁটে প্রাণ হাতে রেখে গা-ঘেঁষে যাওয়া মোটরগাড়ির ভয়ে ভয়ে পথ চলি, সাইকেলের বেশি ব্যবহার তাদের কাছে পথ হাঁটাকে করে তুলবে কম বিপদের।

মোটরগাড়ি যারা আমাদের চড়তে শেখালো, গাড়ির নতুন নতুন ডিজাইন যেখান থেকে আমদানি হয়, যে সব শহর আমাদের তথাকথিত 'স্বপ্ন-জগত'-এর মত, এই সাইকেল চালানো নিয়ে কি সব চিন্তাভাবনা চলছে সেখানে? আমার যে যে শহর সম্বন্ধে বেশ অনেকদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তা একটু ভাগ করে নিতে চাই। প্রায় সব মার্কিন ও ইউরোপীয় শহরে, শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় থাকে সাইকেল আটকে রাখার জন্য তৈরি একধরনের আংটা, যার সাথে চেন বা অন্যান্য ধরনের তালার মাধ্যমে সাইকেলটিকে আটকানো যায়। এটা খুব গুরুত্বপুর্ণ, কারণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে সেইখানে সাইকেল ফেলে রেখে কাজ করে আসার জন্য অর্ন্তবর্তী সময়ে অরক্ষিত সাইকেলের নিরাপত্তা খুব দরকারি জিনিস। সঙ্গে দেওয়া ছবি থেকে পাঠক-পাঠিকারা এই আংটা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। ছবিতে দেখবেন সাইকেলে একটা ছোট অতিরিক্ত সিট, আসল রঙ্গিন ছবিতে এই সিটটা কমলা রঙের ছিল, কিন্তু সাদা-কালো ছবিতেও সিটটা বোঝা যাচ্ছে। এই সিটটা কোনও শিশুকে সাথে নিয়ে নিরাপদভাবে সাইকেল চালানোর জন্য। একই সাথে, পশ্চিমের শহরের প্রায় প্রতিটি বড় রাস্তায় আলাদা করে দাগ দিয়ে রাখা সাইকেল চালানোর পথ, যেটা ধরে সাইকেল এগোবে। প্রসঙ্গত, কদিন আগে লন্ডন শহরে তৈরি হয়েছে শহরের বিশাল এক পথ জুড়ে বিশাল একটি সাইকেল রাজপথ। এটি আলাদা কোনও রাস্তা নয়, স্রেফ সাইকেলের জন্য সাধারণ রাস্তায় নীল দাগ দিয়ে রাখা, লম্বা নিরবিচ্ছিন্ন একটি পথ।

আমি দেখেছি, **বোস্টন, জ্যুরিখ ও আর্মস্টারডাম শহরে পৌরসভা থেকে শহরের নানা জায়গায়**

লন্ডনের টেমস নদীর ধারে একটি সাইকেল। রাস্তার সাইকেল-আংটার সঙ্গে আটকানো রয়েছে। সাইকেলে বাচ্চাদের নিরাপদে বসার কমলা রঙের সিট আছে।

লন্ডন শহরের সাইকেল রাজপথ

সাইকেল রেখে দেওয়া হয়। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে সাইকেল ধার দেওয়া হয় - একটা ফেরতযোগ্য জামানতের মাধ্যমে সাইকেলটি যাতে ফেরত আসে তা নিশ্চিত করা হয়। আর এই ধরনের সাইকেল ধার নেবার জায়গা শহর জুড়ে, এবং গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল, **এক জায়গায় সাইকেল ধার নিয়ে সেটি অন্য কোনও ধার নেবার জায়গায় ফেরত দেওয়া যায়**। এ-যেন শহর-জোড়া মেট্রো রেলের মতই - যে কোনও স্টপ থেকে উঠে যে কোনও স্টপে নামা যায়। কলকাতা শহরে মেট্রো রেলের বিস্তৃতির ব্যাপারে খুব হই-চই হচ্ছে, কথা হচ্ছে মস্ত মস্ত গ্যারেজ তৈরি হবে শহরের কেন্দ্রে। অথচ বোস্টন শহরে, আর্মস্টারডামে আমি দেখেছি - যাতে নিরাপদে সাইকেল থাকতে পারে তার জন্য মেট্রো রেলস্টেশনে ও সাধারণ রেলস্টেশনে সাইকেল রাখার বিরাট ব্যবস্থা। আর্মস্টারডামের কেন্দ্রীয় রেলস্টেশনের কাছের সাইকেল রাখার ব্যবস্থা যে কি বিপুল তা বোঝাতে একটি ছবি এ লেখার প্রথম পাতাতেই রয়েছে। প্রায় চারতলা উঁচু লম্বা বিশাল এই সাইকেল গ্যারেজ। ভর্তি এই গ্যারেজই বোঝায় এই শহরের পৌরসভা পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যকে ছড়া কাটা বা সুভাষিতবলীর মধ্যে সীমিত রাখে না, বরং তা জনজীবনে ব্যাপ্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়। আর এই বিষয়ে কী করছি আমরা, আমাদের শহর কলকাতায়? শহরের কেন্দ্রের বেশ কিছু রাস্তায় সাইকেল ও সাইকেল রিক্সা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন অনেক সাইকেল আরোহী।

সাহেবদের কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র চালানো শিখলাম আমরা, একটু সাইকেল চালানো শিখে দেখা যাক না এবার? ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. গর্গ চ্যাটার্জি কলকাতা থেকে এম বি বি এস পাস করে আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি করেছেন, বর্তমানে তিনি এম আই টি এবং হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। এর পাশাপাশি তিনি নানা পত্রিকায় মানুষের জীবন ও জীবিকার নানা নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা ও পরিবেশ নিয়ে নিয়মিত লিখে থাকেন।

মন

মনের রোগের দশকথা

শরীরের বিভিন্ন রোগ যেমন নানা সহজবোধ্য উপসর্গ ও লক্ষণ নিয়ে আসে, মনের রোগ ঠিক সেভাবে আসে না। ম্যালেরিয়ায় কম্প দিয়ে জ্বর হয়, ডায়াবেটিসে বার বার প্রস্রাব হয়, একজিমা হলে সহজে দৃশ্যমান ঘা হয়, এমনকি পেটে ব্যাথা হলে তা আলসার না গলব্লাডার স্টোন সেটা আজকাল পেট না কেটে যন্ত্র লাগিয়েই বোঝা যায়- হ্যাঁ, জব্বর কিছু হয়েছে বটে।

কিন্তু মনের রোগ? দিব্যি আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, তার বায়না দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার সাবান দিয়ে হাত ধোবে, ধুয়ে ধুয়ে হাতে হাজা হয়ে গেলেও 'কুছ পরোয়া নেহি।' কিংবা ধরুন খাসা মেয়ে, তার যে কি হল, কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিনরাত সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, খায় না দায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না - মাঝে মধ্যে আত্মহত্যার কথা বলে! এটা কি সত্যিই রোগ না ফাঁকিবাজি করার অভিনব কৌশল? সাধারণ মানুষ যে যার মতো ব্যাখ্যা করেন, মনের রোগ না নিছক বাঁদরামি- তা বুঝতে পারেন না। আর তার ফলে মানসিক রোগী শুধু অবহেলিত নন, অনেক সময় সামাজিক অত্যাচারের শিকার হন- আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। লিখছেন **মনোচিকিৎসক** ডা. সুমিত দাশ

'ইচ্ছে করে পরাণটারে গামছা দিয়ে বাঁধি ...' সেদিন লোকাল ট্রেনে ব্যান্ডেল যাচ্ছি কানে এল গানটা। দেখলাম একজন অন্ধ মানুষ গানটা গাইতে গাইতে ভিক্ষে করছেন। মানিব্যাগ বার করে খুঁজে পেতে একটা একটাকার কয়েন বার করে দিতে যাব, হঠাৎ - 'মার, মার এ রোগের দাওয়াই হচ্ছে গুছিয়ে মার। ও সব ডাক্তার ফাক্তারে কিছু হবে না। মনের বদমায়েসির আবার ওষুধ...।'

বাজখাঁই আওয়াজ শুনে মুখ তুলে দেখলাম কোনের সিটে বসে থাকা পাকানো চেহারার এক লিকপিকে ভদ্রলোক হচ্ছেন আওয়াজের উৎস। তাঁকে ঘিরে আরো তিন চারজন। আলোচনায় কান পাতলাম। বুঝলাম একজনের পাড়ায় একজন মানুষ দিব্যি কাজকম্ম করছিলেন এতোদিন, ইদানিং একটু বেগড়বাঁই করছেন। কাজে যাচ্ছেন না, চক্‌রা বকরা জামা পরছেন, প্রচুর সিগারেট খাচ্ছেন, লারে লাপ্পা গান করছেন, মেয়েদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলছেন ইত্যাদি। তো তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে ভদ্রলোক তার নিদান দিলেন।

এরকম বহু ঘটনা আমরা রোজই শুনছি, দেখছি। এই সব টুকরো টাকরা ঘটনা, সংলাপ, কিছু জিজ্ঞাসাকে সাজিয়ে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১. মনের রোগ আসলে কি বদমায়েসি?

এ ধারণার উৎস অনেক গভীরে। ট্রেনের সেই অন্ধ ভিখারী যে গানটা গাইছিলেন — সেখানে গানটির স্রষ্টা পরাণটাকে, যেটাকে আমরা ব্যাপকার্থে মনের সমতুল্য ভাবতে পারি, বাঁধার কথা ভেবেছিলেন। অর্থাৎ তিনি হাত পায়ের মত তাকে একটা অঙ্গই ভেবেছিলেন। কিন্তু, ট্রেনের সেই লিকলিকে ভদ্রলোকের মত অধিকাংশেরই ঠিক বিপরীত অবস্থান। ভাবেন মন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই মনের যে প্রকাশ অর্থাৎ মেজাজ, আবেগ, স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিতে কোন অস্বাভাবিকত্ব দেখলে লোকে ভাবেন এটা বদমায়েসি করছে। প্রকৃতপক্ষে যতটুকু বোঝা গেছে মনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর

করে মস্তিষ্কের কতগুলি রাসায়নিক পদার্থের সুষ্ঠু ক্রিয়ার উপরে। কোন কারণে এই পদার্থগুলির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষটির বাহ্যিক আচরণেরও ভারসাম্য নষ্ট হয়। এটা কোন বদমায়েসি নয়। এটা একটা রোগ।

২. মনের রোগের আবার ওষুধ হয় নাকি?

যেহেতু মনকে বিমূর্ত ভাবা হয়, তাই অনেকে ভাবেন মনের রোগের ওষুধ নেই। অথচ, প্রকৃতপক্ষে কতগুলি রাসায়নিক পদার্থের কমা-বাড়া বা ভারসাম্যহীনতার জন্য মনের রোগ হয়; তাই বাইরে থেকে অন্য রাসায়নিক পদার্থ বা ওষুধ প্রয়োগ করে মনের রোগ সারানো বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩. মনের রোগ কি সারে?

রোগ সেরে যাওয়া বলতে যদি বোঝা হয় যে ওষুধ দিয়ে বা অন্য কোনও ভাবে একবারে রোগ ঠিক

> **বর্তমানে বেশ কিছু ওষুধ বেরিয়েছে যেগুলিতে ঘুমের পার্শ্বক্রিয়া নেই বললেই চলে।**

হওয়ার পরে আর কখনও হবে না তা হলে, সার্জারি করে সারানো কতগুলি রোগ ছাড়া কোনও রোগ চিকিৎসকরা সারাতে পারেন না। এমনকি, আমাশা, সর্দি-কাশিকেও চিরকালের মত সারানোর নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। অধিকাংশ রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হাঁপানি, বাত ইত্যাদির চিকিৎসা সারা জীবন করে যেতে হয়। অধিকাংশ মনের রোগের ক্ষেত্রেই ওষুধ সারা জীবন খেতে হয়, তাহলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দু'তিন বছর বা আরও কম সময় ওষুধ খেলেও চিরকালের মত মনের রোগ সেরে যায়।

৪. মনের রোগের ওষুধ কি আসলে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে?

প্রায় সব মনের রোগেরই একটা মূল উপসর্গ হচ্ছে ঘুম কমে যাওয়া। তাই ঘুম ঠিক করাটা মনের চিকিৎসার একটা মূল লক্ষ্য থাকে। তাছাড়া মনের রোগের অধিকাংশ ওষুধের একটা মূল পার্শ্বক্রিয়া হচ্ছে ঘুম পাড়ানো। তাই ওষুধ প্রয়োগে রোগীর ঘুম বেশি হয়। তার মানে এই নয় যে, ঘুম পাড়িয়ে রাখাই একমাত্র চিকিৎসা। বর্তমানে বেশ কিছু ওষুধ বেরিয়েছে যেগুলিতে ঘুমের পার্শ্বক্রিয়া নেই বললেই চলে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ওষুধ চালানোর পরে শরীর এই পার্শ্বক্রিয়াকে সহ্য করে নেয়, তখন ঘুমের প্রকোপও কমে যায়।

৫. মনের রোগের ওষুধ বেশি খাওয়া উচিত নয় কারণ ওষুধগুলি হার্ট, কিডনী, লিভার খারাপ করে।

পরিষ্কার বলে নেওয়া যাক মনের রোগের এরকম কোন ওষুধ নেই যেটা হার্ট, কিডনী, লিভারের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। তবে ঐ সব অঙ্গের কোন রোগ হলে, ওষুধের মাত্রা কমাতে হয় বা কিছু ওষুধ বন্ধ করতে হয়।

৬. মনের রোগ কি ছোঁয়াচে?

মনের রোগ ছোঁয়াচে নয়। তবে অনেক ধরনের মনের রোগের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের রোগ থাকলে বংশগতির মাধ্যমে সন্তানের মনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৭. মনের রোগী মানেই কি পাগলা গারদে পাঠাতে হবে?

পাগলা গারদ কথাটা এখন ব্যবহার করা হয় না। কারণ গারদ কথাটার সঙ্গে সমাজবিরোধী বা জীবজন্তুকে আটকানোর জায়গার কথা জড়িত। কিছু কিছু অতিরিক্ত উত্তেজিত রোগী ছাড়া প্রায় সকলকেই বাড়িতে চিকিৎসা সম্ভব। প্রয়োজনে মানসিক রোগীদের নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।

৮. মনের রোগ আসলে বড়লোকদের অসুখ।

এই ধারণাটা সঠিক নয়। সারা পৃথিবীতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে ধনী ও তথাকথিত উন্নত দেশ এবং গরীব ও তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে মানসিক রোগীর সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে প্রায় সমান। তবে রোগের ধরন ও কারণগুলি কিছুটা আলাদা।

৯. মনের রোগ কি সত্যিই বাড়ছে?

মনের রোগের এক বড় কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ। বর্তমানে সমাজে নানা কারণে মানসিক চাপ বাড়ছে, ফলে মনের রোগও বাড়ছে। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামনে উঠে এসেছে। **প্রথমত,** দারিদ্র্য— এই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ যে কোন মাপকাঠিতে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। খাওয়া পরার নিশ্চয়তা যেখানে নেই, সেখানে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়ত,** বাস্তুচ্যুতি— সারা পৃথিবীই অশান্ত। গৃহযুদ্ধ বা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই আছে। এছাড়া উন্নয়নের নামে কারখানা তৈরি, বিশাল বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট-ফ্লাইওভার তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। ফলে প্রচুর মানুষ গৃহহীন হচ্ছেন। এই ভাসমান গোষ্ঠীর জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, এদের মধ্যে মনের রোগও বেশি। **তৃতীয়ত,** দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা--- সারা পৃথিবীতেই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নতুন নতুন বিনোদন, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। এগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা চাওয়া পাওয়ার ফারাকের জন্য মানসিক চাপ বাড়ছে। ফলে মানসিক রোগও বাড়ছে। **চতুর্থত,** বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি — সমাজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে। ফলে যাঁরা এই ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে সেই ধনী দেশের মানুষেরা বেশীদিন বাঁচছেন। কিন্তু, বৃদ্ধ মানুষদের একাকিত্ব, কর্মহীনতা, শারীরিক অক্ষমতা তাঁদেরকে অনেক ক্ষেত্রে মনের রোগী করে তুলেছে। এছাড়া, আরও নানা কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্কে জটিলতা বাড়ছে, বাড়ছে মানসিক রোগ।

১০. মনের রোগকে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে কি?

সাধারণ ভাবে একজন মানুষের অ্যাপেণ্ডিক্সের ব্যথা উঠলে, হার্ট অ্যাটাক হলে, হাত-পা ভাঙ্গলে বা নিদেন পক্ষে জ্বরজারি হলেও লোকে সেটা বুঝতে পারেন এবং গুরুত্ব দেন। কিন্তু অক্ষত শরীরে একজন মানুষ শুয়ে থাকছেন, বলছেন ভালো লাগছে না কাজ করতে, বা উল্টো-পাল্টা কথা বলছেন— সাধারণ ভাবে মানুষের কাছে এটা গুরুত্ব পায় না বা বোধগম্য হয় না। কিন্তু, ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে উল্টো। রোগের ভয়ঙ্করত্ব মাপার যে মাপকাঠি বা স্কেল - DALY [Disability Adjusted Life Years]-তে দেখা গিয়েছে, এই পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর ১০টি রোগের মধ্যে ৫টি হচ্ছে মানসিক রোগ। সুতরাং মনের রোগকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

> **অধুনা 'উন্নয়ন'-এর চাপে প্রচুর মানুষ গৃহহীন হচ্ছেন। এই ভাসমান গোষ্ঠীর জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, এদের মধ্যে মনের রোগও বেশি।**

দশকথার বাইরেও অনেক কথা রয়ে গেল। পরে সুযোগ হলে বা পাঠকরা যদি জিজ্ঞাসা করেন, জানানো যাবে। ❑

লেখক পরিচিতি - ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তা ছাড়াও যুক্ত আছেন শ্রমজীবি মানুষদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের সাথে।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমাকলীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক। প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

e-mail : aneek.bm@gmail.com

অনুবীক্ষণ

এফ এন এ সি

এফ এন এ সি-র পুরো কথাটা হল ফাইন নিডল অ্যাস্পিরেশন সাইটোলজি। লম্বা নামটা যত বিদঘুটে শোনাক, এ হল বহু জটিল রোগকে দ্রুত ধরে ফেলবার এক জব্বর কায়দা, অথচ রোগীর অসুবিধে নেই কিছুই। অনেক ক্ষেত্রে 'বায়োপ্সি'- পরীক্ষার বদলে এই সহজ ও দ্রুত পরীক্ষাটিই যথেষ্ট, আবার কিছু ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটিই বলে দেয় 'বায়োপ্সি'-র দরকার আছে কিনা। এফ এন এ সি যথাসময়ে করে পরের অনেক দামী পরীক্ষা এড়ানো যায়, বাঁচে অর্থ, ভোগান্তি, এবং বাঁচে জীবন। **লিখছেন ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়।**

রোগির গলায় গ্ল্যান্ড ফুলেছে

আজ থেকে বছর দশেক আগেও এ-শব্দটা প্রায় অজানা ছিল। শিক্ষিত বাঙালীও কথাটা শুনে বলতেন - এফ এন এ সি? সেটা আবার কী? কিন্তু অবস্থা বদলাচ্ছে, আর অনেক ডাক্তারি পরিভাষাই এখন সংবাদপত্রের আর টিভি চ্যানেলের স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠানের দৌলতে অজানা নয়। অনেকেই এখন অনেক টেকনিক্যাল শব্দ শোনেন বা পড়েন, তার অর্থটাও বোঝেন বেশ খানিকটা। কিন্তু লোকের মুখে মুখে দূর থেকে আরও দূরে যেতে যেতে তথ্যের সঙ্গে বেশ খানিকটা জল মিশে যায়, ফলে বহু মানুষ ঠিক অর্থ জানেন না। সঠিক তথ্যগুলো রোজকার ব্যবহৃত ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা ডাক্তারদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে দরকার। ডাক্তার-নার্স বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর্মী রোগী ও তাঁর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যখন আলোচনা চালান, তখন একে অপরের কথা বুঝতে পারার ক্ষমতাটা অপরিহার্য। এঁরা বললেন এক কথা, তাঁরা বুঝলেন অন্য জিনিস, এতে দুপক্ষেরই ক্ষতি। তাই নতুন ব্যবহৃত ইংরেজি ডাক্তারি শব্দগুলোর মানে রোগী তথা সাধারণ মানুষকে চলতি ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

এফ এন এ সি জিনিসটা কী?

রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষার কথা বললে বেশির ভাগ মানুষই ভাবেন রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদির পরীক্ষা। বায়োপ্সি শব্দটিও অনেকের জানা আছে — এ শব্দটি উচ্চারণ মাত্রই শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়, যেন বায়োপ্সি আর কর্কটরোগ সমার্থক। এফ এন এ সি শব্দটি এখনও আমজনতার মধ্যে ততটা প্রচলিত নয়। এফ এন এ সি (FNAC - Fine Needle Aspiration Cytology) একটি পরীক্ষা যা হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে হয়। এই পরীক্ষায় - **শরীরের রোগাক্রান্ত অংশে একটি ইঞ্জেকশনের সূঁচ প্রবেশ করিয়ে সিরিঞ্জের সাহায্যে রস টেনে নেওয়া হয়। রসের সঙ্গে সূঁচটির ভিতর কিছু কোষও চলে আসে। এবার সেই রস কাঁচের স্লাইডের উপর মাখিয়ে নিয়ে (Smear) উপযুক্ত রঙ করে (Stain) মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখা হয়।** Cyto অর্থাৎ কোষ নিয়ে চর্চা করা হয় তাই Cytology, আর যেহেতু সরু সূঁচের (Fine Needle-এর) সাহায্যে পরীক্ষার মালমশলা শরীর থেকে টেনে (Aspirate করে) জোগাড় করা হয় তাই Fine Needle Aspiration।

পরীক্ষাটি করতে আগে থেকে রোগীর কোনও প্রস্তুতি লাগে না, অর্থাৎ খালি পেটে আসতে হবে না। কোনও অবশ করার ওষুধ লাগে না। হ্যাঁ, সূঁচ ফোটানোটা মোটেও আরামদায়ক নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যদি ব্যাপারটা আগে থেকে ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয় তাহলে এই সূঁচ ফোটানোর ব্যথা বেশির ভাগ রোগীই সহ্য করে নেন। এমনকি শিশুদেরও নিয়েও আমাদের খুব সমস্যা পেতে হয় না।

এই পরীক্ষাটির রিপোর্ট কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে যায় অর্থাৎ সেদিনই রিপোর্ট রোগী পেতে পারেন। বায়োপ্সি পরীক্ষার চাইতে এই ব্যাপারে এফ এন এ সি অনেকটাই সুবিধাজনক। তবে খুব ব্যস্ত হাসপাতালে যেহেতু প্রতিদিন এফ এন এ সি ক্লিনিকে অনেক রোগীর পরীক্ষা হয়, এতোগুলি স্লাইড রং করা ও মাইক্রোস্কোপে দেখা সময়সাপেক্ষ, তাই সাধারণত দুই বা তিনদিন পরে রিপোর্ট দেওয়া হয়। কিন্তু রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী দু-তিন ঘন্টায়ও রিপোর্ট দেওয়া হয়ে থাকে।

এই পরীক্ষাটি কাদের দরকার?

আউটডোরে অনেক রোগী আসেন শরীরের কোথাও তৈরি হওয়া একটি ফোলা বা ক্ষুদ্র একটি স্ফীতি-এই উপসর্গ নিয়ে। স্ফীতিটি চোখে দেখা যেতে পারে, অথবা এমনও হতে পারে যে সেটি চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাত দিয়ে অনুভব করা যাচ্ছে। এই উপসর্গগুলি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। সাধারণ ফোঁড়াও হতে পারে, কোনও গ্রন্থির রস বার হবার পথ বন্ধ হয়ে ফোলা তৈরি হতে পারে, আবার কোনও টিউমার বা আবও হতে পারে। এই ফোলার সঙ্গে ব্যথা থাকতেও পারে। ব্যথা না থাকলে রোগী খুব উদ্বিগ্ন হন না। কিন্তু ব্যথাহীন ফোলাগুলিই দুশ্চিন্তার কারণ--- এগুলি অনেক সময়ই সংহারক বা ম্যালিগন্যান্ট বের হয়।

একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে টিউমার আর ক্যানসার কখনোই সমার্থক নয়। একটা নিরাপদ (Benign) টিউমার প্রায় সব সময় সাধারণ অপারেশন করলেই নিরাময় হয়, বেশির ভাগ সময় তার কোনও পুনরাবৃত্তিও হয়ও না। তবে সংহারক (ম্যালিগন্যান্ট) টিউমার অর্থাৎ ক্যান্সারজাতীয় টিউমার সারাতে গেলে বড় অপারেশন লাগে এবং তার পরেও বিশেষ ধরণের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা (Chemotherapy) বা রেডিওথেরাপি ইত্যাদি করতে হতে পারে। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আবার একাধিক ধরণের হয়, যেমন, কারসিনোমা, সারকোমা, লিম্ফোমা প্রভৃতি। তাদের প্রতিটি ধরনের চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা।

ধান ভানতে শিবের গীত ?

তা হতে পারে, কিন্তু একটু ধৈর্য যে ধরতেই হবে। না হলে এফ এন এ সি-র প্রয়োজনীয়তা সম্যক ভাবে বোঝা যাবে না। গলায় একটা গ্ল্যান্ড বা লসিকাগ্রন্থি নানা কারণে ফুলতে পারে। সাধারণ জীবাণুর

রোগির গলার গ্ল্যান্ড থেকে সাকশান করে কোষকলা নেওয়া হচ্ছে

আক্রমণের ফলে প্রদাহের জন্যে ফোঁড়ার মতো হয়ে গ্ল্যান্ড ফুলতে পারে। ফুলতে পারে টিবির জন্যও; আমাদের দেশে টিবি খুব সাধারণ অসুখ আর তা অনেক সময়েই গলার লিম্ফ-গ্ল্যান্ড বা লসিকা গ্রন্থিগুলিকে আক্রমণ করে। আবার লিম্ফোমা অথবা শরীরের ভিতরের কোনও ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার (মেটাস্ট্যাসিস) কারণেও গলায় এক বা একাধিক গ্ল্যান্ড ফুলতে পারে।

এদের সাধারণ লক্ষণ মোটের ওপর এক হলেও চিকিৎসা আর নিরাময়ের ব্যাপারে এদের মধ্যে ফারাক বিস্তর। প্রথমটিতে, অর্থাৎ সাধারণ জীবাণুর আক্রমণের জন্য, শুধু অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, দরকার হলে পূঁজ বার করে দিতে হবে, ব্যাস্। টিবির কারণে গ্ল্যান্ড ফুললে টিবি-র যথাবিহিত চিকিৎসা করলে পুরোপুরি নিরাময় হবে। কিন্তু যদি লিম্ফোমা হয়, তা হলে কেমোথেরাপি লাগবে; আর যদি ক্যান্সারের ছড়িয়ে পড়ার কারণে গ্ল্যান্ড ফুলে থাকে তাহলে আরও বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগবে।

এই যে ভীষণ জরুরী প্রাথমিক ভাগাভাগিটা - এটা খুব সহজ হয়ে গেছে এফ এন এ সি চালু হওয়ার পর থেকে। প্রদাহের জন্য বা টিবির জন্য গ্ল্যান্ড ফুললে এফ এন এ সি দিয়েই ডায়াগনোসিস হয়ে যায় - এটাই তখন 'ফাইন্যাল ডায়াগনোসিস'। লিম্ফোমার ক্ষেত্রে বায়োপ্সি করাই বিধেয়, কারণ লিম্ফোমার নানান প্রকারভেদ আছে, যাদের চিকিৎসা আলাদা এবং লিম্ফোমার শ্রেণিবিভাগ বায়োপ্সি ছাড়া সম্ভব নয়। শরীরের ভিতরের কোনও ক্যান্সার ছড়িয়ে পরা, অর্থাৎ মেটাস্ট্যাসিস-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আবার দুরকম হতে পারে - ১) রোগীর ক্যান্সার, আগে থেকেই রোগ ধরা পড়ে গেছে। এমন রোগীর গলার গ্ল্যান্ডে যদি মেটাস্ট্যাসিস পাওয়া যায়, তাহলে আর বায়োপ্সির দরকার নেই, যেহেতু আমরা জানি রোগীটির ক্যান্সার আছে, কোথায় আছে এবং কি ধরনের ক্যান্সার। এখন শুধু ক্যান্সার ছড়াচ্ছে বুঝে সেই অগ্রবর্তী পর্যায় অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে। কিন্তু যদি গলার লিম্ফ গ্ল্যান্ডটিই লুকিয়ে থাকা ক্যান্সারের দিকে প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করে, সেক্ষেত্রে বায়োপ্সি লাগতে পারে।

তাহলে এই যে গলার গ্ল্যান্ড ফোলার উপসর্গ, সেটা কিন্তু সব সময়ে নেহাত তুচ্ছ করার মত জিনিস নয়। তাদের কেউ অতি সামান্য অসুখের প্রকাশ, আবার কেউ অতি ভয়ঙ্কর অসুখের লক্ষণ। এই

গ্ল্যান্ড থেকে টানা কোষকলা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হচ্ছে

উদাহরণ দিয়ে বোঝা গেল যে, এফ এন এ সি দিয়েই বহু ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব। অথচ এই পরীক্ষাটি চালু হওয়ার আগে হয় রোগীকে প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করে, কেবলমাত্র সেই ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করতে হত, না হলে বায়েপ্সি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেতে হত।

প্রথমেই বায়োপ্সি নয় কেন?

বায়োপ্সিতে শরীর থেকে কোষকলা বা মাংস কেটে নেওয়া হয়, সেটা করতে স্থানিক অবেদন (লোক্যাল অ্যানেস্থেসিয়া) বা সম্যক অবেদন (জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া) অপরিহার্য, অথচ তার অনেক ঝুঁকি আছে। সম্যক অবেদনের আগে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, ইত্যাদি করতে হয়। আর বায়োপ্সি করতে হয় অপারেশন থিয়েটারের ভিতর। বায়োপ্সি করে রিপোর্ট পেতে কম করে ৭ দিন সময় লাগে, খরচও বেশি হয়। অথচ এফএনএসি করতে না লাগে অ্যানেস্থেসিয়া, না লাগে অপারেশন থিয়েটার। রিপোর্টও তৈরি হয় অনেক তাড়াতাড়ি, খরচও অনেক কম।

অনেক লোকের ধারণা আছে যে বায়োপ্সি করলে ক্যান্সার ছড়িয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বায়োপ্সি বা এফ এন এ সি কোনটাই ক্যান্সারের ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে না। বস্তুতঃ, এফ এন এ সি যেহেতু একটা আন্দাজি ব্যাপার (blind procedure), অনেক সময় সন্তোষজনক ভাবে নমুনা সংগ্রহ করা যায় না - হয় তো সূঁচটা যে জায়গায় গেল সেখানে মূল রোগের ওপর কিছু অতিরিক্ত পরিবর্তন হয়েছে। বা হয়তো টিউমারটির যে কোষগুলি দিয়ে তৈরি সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সূঁচে এলো না - এই সব ক্ষেত্রে আরও দু-তিন বার এফ এন এ সি করা চলতে পারে, এতে রোগ বা রোগীর বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। শরীরের অভ্যন্তরে রোগসৃষ্টি হলে, যেমন, লিভার, কিডনি, ফুসফুস প্রভৃতিতে, সিটি স্ক্যান বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ছবি দেখে ঠিক দরকারমত জায়গা থেকে কোষ সংগ্রহ করা হয়। ফলে দেহের গভীরে অবস্থিত এই সব ক্ষতগুলোরও জাত নির্ণয় এখন সহজ হয়ে গেছে। সিটি স্ক্যান বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ছবির সুবিধা না থাকলে পার্শ্ববর্তী রোগমুক্ত জায়গা থেকেই হয়ত এফ এন এ সি করা হয়ে যেত, কিন্তু সেখানে রোগের তো কোনও চিহ্ন নেই, ফলে ওই জায়গাটায় সূঁচ গেলে ভুল ডায়াগনোসিস হত, আমরা যাকে বলি false negative। সংক্রমণের ফলে যে সব অসুখ হয়, যেমন- টিবি, অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, ইত্যাদি এসব এফ এন এ সি-র সাহায্যে সহজেই ডায়াগনোসিস করে নিরাময় করা যাচ্ছে। আবার লিভারে যে ক্ষতটি আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সেটি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, না কুকুরপ্রীতির ফলে পাওয়া হাইডাটিড সিস্ট নামক ক্রিমিঘটিত অসুখ, না কি টিউমার, আবার টিউমার হলে লিভারের নিজস্ব গ্রোথ না অন্য কোথাও থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, এ সবই এফ এন এ সি করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা সম্ভব।

এবং হ্যাঁ, এফ এন এ সি করে এতো কিছু বলতে সার্জেন বা সার্জারি লাগে না; লাগে না অ্যানেস্থেটিস্ট বা অ্যানেস্থেসিয়া! এখন মহিলাদের মধ্যেই স্তনগ্রন্থির টিউমার খুব বেশি দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে স্তন ক্যান্সার-এর প্রকোপও বাড়ছে। এখানে এফ এন এ সি অপরিহার্য, এফ এন এ সি করে যদি দেখা যায় ফাইব্রোঅ্যাডিনোমার মত নির্দোষ টিউমার তাহলে দরকার খুব ছোট একটা অপারেশন। কিন্তু যদি এ পরীক্ষায় ক্যান্সার ধরা পড়ে, তখন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু ঠিক করবেন আগে বড় অপারেশন হবে না কয়েক সাইকেল কেমোথেরাপি আগে দেওয়া হবে তার পর বড় অপারেশন।

খুবই নিরীহ একটি সূঁচ, কিন্তু অসামান্য তার ক্ষমতা। অনেক রোগীই এফ এন এ সি ক্লিনিকে এসে কনুই মেলে ধরেন রক্ত দিতে হবে ভেবে, নইলে সূঁচ আর কি কাজে লাগবে। কেউ বা অনুরোধ করেন তাড়াতাড়ি করে দেবার জন্যে কারণ তিনি সকাল থেকে না খেয়ে আছেন! আবার কেউ কেউ এমনও আছেন যাঁরা শিরা ছাড়া অন্য কোথাও সূঁচ ফোটানো হবে শুনে রেগে মেগে পরীক্ষা প্রত্যাখ্যান করে বেরিয়ে যান এমন কথা জীবনেও শোনেননি বলে!

কে এঁদের বোঝাবে জীবনে-না-শোনা এই ছোট্ট সস্তা পরীক্ষা তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে পারে? ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, এম ডি, ডি সি পি, একজন প্যাথলজিস্ট। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

চিকিৎসা-বিতর্ক

জরায়ুমুখ ক্যান্সার ও এইচ পি ভি ভ্যাকসিন

আমরা **স্বাস্থ্যের বৃত্তের** আগের সংখ্যায় জরায়ুমুখ ক্যান্সার ও তার প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত রোগনির্ণয় করে চিকিৎসা করে কত নারীকে বাঁচানো সম্ভব - সে নিয়ে আলোচনা করেছি। কম বয়সে বিবাহ আটকানো, বহু-গর্ভধারণ রোধ, স্ত্রী-যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা বজায়, একজন মাত্র যৌনসঙ্গী বা অন্যথায় কনডোমের ব্যবহার, যৌনাঙ্গে যে কোনও সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা - এ সব করেই অনেক জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া প্যাপ টেস্ট-এর মত যেসব রুটিন পরীক্ষা দ্বারা প্রাক-ক্যান্সার ক্ষত নির্ণয় করে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিয়ে পুরোদস্তুর ক্যান্সার হওয়া আটকানো যায়, বা অতি প্রাথমিক ক্যান্সারকে সারিয়ে ফেলার চিকিৎসা করা যায় - সেসবই আলোচিত হয়েছে। এই কম খরচের পদ্ধতিগুলো পালন করলে অধিকাংশ জরায়ুমুখ ক্যান্সার ঠেকানো যায়, আর সে রোগ দেখা দিলেও তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে অবশ্য সরকারি-বেসরকারি উভয় তরফেই এ সব ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেই, সুতরাং এ সব পদ্ধতির যথাযথ সুফল আমাদের নারীরা পাচ্ছেন না, কিন্তু সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। অধুনা বলা হচ্ছে যেহেতু জরায়ুমুখের প্রায় সব ক্যান্সারের আদিতে আছে এইচ পি ভি নামক ভাইরাসের সংক্রমণ, সুতরাং সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা হল এইচ পি ভি ভাইরাস সংক্রমণ আটকানোর টিকা। বাজারে সেই টিকা এসেও গিয়েছে। এই টিকাই কি তাহলে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় আশা? আলোচনা করছেন **ডা. চঞ্চলা সমাজদার**।

বিগত সংখ্যায় জরায়ুমুখ ক্যান্সার নিয়ে বলার সময়ে আমরা বলেছিলাম যে এর প্রায় ৯৯ শতাংশের জন্য দায়ী এক ভাইরাস - সে ভাইরাসের নাম এইচ পি ভি, পুরো নাম হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। তবে এক্ষেত্রে ভাইরাসের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক মোটেই তেমন সহজ সরল নয়। ভাইরাসের সঙ্গে রোগের সহজ সরল সম্পর্কের উদাহরণ হল পোলিও ভাইরাসের থেকে পোলিও রোগ, বা মিসলস্ ভাইরাস থেকে মিসলস্ বা হাম। ভাইরাস শরীরে ঢুকল, এবার শরীর তাকে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত ক্ষমতা দেখাতে না পারলেই ব্যাস - ভাইরাস-জনিত রোগটার লক্ষণ দেহে ফুটে উঠল। এসব ক্ষেত্রে পোলিও-র টিকা দিয়ে পোলিও প্রতিরোধ বা মিসলস্-এর টিকা দিয়ে মিসলস্ বা হাম ঠেকানো - এসব খুব স্বাভাবিক যুক্তিসংগত, এবং পরীক্ষায় প্রমাণিতও বটে। কিন্তু নানা কারণে এইচ পি ভি-প্রতিরোধক টীকা দিয়ে জরায়ুমুখ ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবেই - এমন ধারণা অতিসরলীকরণ ও অবৈজ্ঞানিক, এবং পরীক্ষায় অপ্রমাণিতও। অথচ এই ভাইরাসের টিকা বাজারে এসে গেছে, এবং তার প্রচারও চলছে বাজারী ঘরানাতে - "আমাদের নাতনীদের প্রজন্ম হোক ক্যান্সার মুক্ত।" কেন এই প্রচার, আর কেনই বা আমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি, সে আলোচনাতে এবার আসব।

সারা বিশ্বে বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি মহিলা জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই বছরে প্রায় চুয়াত্তর হাজার মহিলা এই রোগে মারা যান।

শুরুতেই কতকগুলো তথ্য পুনরুল্লেখ না করে পারছি না। এইচ পি ভি-সংক্রমণ মানেই জরায়ুমুখ ক্যান্সার নয়। এইচ পি ভি সংক্রমণের পর শতকরা সত্তর ভাগ মহিলার ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে সংক্রমণ নিজে থেকেই সেরে যায়, আর দু বছরের মধ্যে সংক্রমণ নিজে থেকে সেরে যায় শতকরা নব্বই ভাগ মহিলার ক্ষেত্রে। বাকি পাঁচ-দশ শতাংশের ক্ষেত্রে সংক্রমণ থেকে যায়, এবং তাদেরই কারো কারো জরায়ুমুখ ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং জরায়ুমুখ ক্যান্সার হতে পারে এই আশংকায় সমস্ত কিশোরী বা তরুণীকে এইচ পি ভি টিকা দেওয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত তা তর্কসাপেক্ষ।

কত ধরনের ভাইরাস ঠেকাবে এই ভ্যাকসিন?

কমবেশি প্রায় একশো ধরনের (টাইপ-এর) এইচ পি ভি আছে। এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে বারো-তেরোটি ধরন হল বেশি ঝুঁকির ধরন, এবং এগুলির সংক্রমণ জরায়ুমুখ ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত, জড়িত

পুং-জননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সার ও মুখগহ্বরের ক্যান্সারের সঙ্গেও। শতকরা সত্তর ভাগ জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে টাইপ ১৬ এবং টাইপ ১৮ জড়িত। এইচ পি ভি টাইপ ৪৫ এবং টাইপ ৩১ -এ দুটোই প্রায় চার শতাংশ করে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত। আর এইচ পি ভি টাইপ ৬ এবং টাইপ ১১ জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল বা আব তৈরি করে।

যখন থেকে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের সাথে এইচ পি ভি ভাইরাসের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকেই ওষুধ কোম্পানিগুলি এর টিকা তৈরির জন্য জোর কদমে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। সবাই জানেন রোগ থেকে মুক্তির জন্য টিকার আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে এক বিরাট আশীর্বাদ-স্বরূপ। গুটি বসন্তের মত মারক রোগ থেকে সমস্ত পৃথিবী যে মুক্ত হতে পেরেছে তা এই গুটি বসন্তের ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকার প্রয়োগেই। আরও বেশ কিছু টিকা আছে যাদের ঠিকভাবে যথাসময়ে প্রয়োগ করলে অনেক মৃত্যু, বিশেষত শিশুমৃত্যু ও গর্ভবতী মা-এর মৃত্যু এড়ানো যায়, বিকলাঙ্গতা রোধ করা যায়, ব্যাধি ঠেকানো যায়।

কিন্তু এইচ পি ভাইরাসের বিরুদ্ধে যে ভ্যাকসিন তা সঙ্গে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধের সম্পর্কটা কি এতোই সরলরৈখিক? দুটি এইচ পি ভি ভ্যাকসিন বাজারে এসেছে। মার্ক কোম্পানির 'গার্ডসিল' আর গ্ল্যাক্সো-স্মিথ-ক্লাইন-এর 'সার্ভারিক্স'। 'গার্ডাসিল' ভ্যাকসিনটি কেবল এইচ পি ভি-র টাইপ ১৬, ১৮, ৬ ও ১১ কে প্রতিরোধ করতে পারে। 'সার্ভরিক্স' ভ্যাকসিনটি পারে কেবল এইচ পি ভি-র টাইপ ১৬ ও ১৮ কে প্রতিরোধ করতে। মনে রাখবেন, এইচ পি ভি ভাইরাসের টাইপ ১৬ ও ১৮ জরায়ুমুখ ক্যান্সারের মোটামুটি সত্তর শতাংশের জন্য দায়ী। আর এইচ পি ভি -র টাইপ ৬ ও ১১ জননেন্দ্রিয়ের আঁচিল তৈরি করে। তা হলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শতকরা তিরিশ ভাগ জরায়ুমুখ ক্যান্সার আটকানোর ব্যাপারে দুটো ভ্যাকসিনের কোনোটারই কোনও ক্ষমতা নেই। এটা জেনে শুনেই ২০০৬ সালে আমেরিকার এফ ডি এ, অর্থাৎ ওদেশে ওষুধ ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা, ভ্যাকসিন দুটিকে ছাড়পত্র দিয়েছে।

কখন দেবেন ভ্যাকসিনটি, আর কতটা প্রতিরোধ আশা করবেন?

আমাদের মনে রাখা দরকার যে সারা পৃথিবীতে এ-তাবৎ এইচ পি ভি ভ্যাকসিনের পরীক্ষালব্ধ তথ্য অতি সীমিত। যৌনসংসর্গের ফলে যে ধরনের ক্যান্সার হতে পারে তার বিরুদ্ধে যদি টিকাটিকে কার্যকর হতে হয় তবে যৌনসম্পর্ক তথা যৌনজীবন শুরু হবার আগেই টিকা দিতে হবে। একবার যৌনজীবন শুরু

হয়ে গেলে সে নারীর শরীরে কবে যে এইচ পি ভি ভাইরাস প্রবেশ করবে তার কোনও দিনক্ষণ নেই, আর একবার ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশ করার পর 'গার্ডাসিল' বা 'সার্ভারিক্স' কোনটিই যে কার্যকর নয় তা টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানিদুটি নিজেরাই জানিয়েছে। সে কারণেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাষ্ট্রে ৯ বছর বয়সের সবাইকে এই টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। এতেও যে পুরো রক্ষা হবে তার গ্যারান্টি নেই, কেননা যৌনসম্পর্ক ছাড়াই কেবল শারীরিক সংস্পর্শের কারণে এমনকি পাঁচ-সাত বছরের শিশুরও শরীরে এইচ পি ভাইরাস প্রবেশ করেছে এমন ঘটনাও আছে। **টীকাকরণের পরে ঠিক কতদিন তার ভাইরাস-প্রতিরোধক ক্ষমতা কার্যকর থাকে তাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, মোটামুটি পাঁচ বছর, কি বড়জোর সাত বছর, এদের কার্যকারিতার মেয়াদ।**

কোম্পানির দাবি অনুযায়ী, ছয় মাস সময়ের মধ্যে তিনটি ইঞ্জেকশন দিতে হবে, তা হলে শরীরে ভাইরাস-প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে উঠবে। তারপর যেহেতু প্রতিরোধ ক্ষমতা বছর পাঁচেকের মত থাকবে সেহেতু পাঁচ বছর অন্তর বুস্টার ডোজ নিতে হবে এটা ধরে রাখাই বিজ্ঞান সম্মত, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্মতও বটে। খরচার দিকটাই যদি দেখি, প্রথম তিনটি ইঞ্জেকশনেই খরচ হবে ইঞ্জেকশন-পিছু মোটামুটি তিন হাজার টাকা, মোট ন'হাজার টাকা। এবার ন'বছর বছর বয়স থেকে টিকা নিতে শুরু করলে সেটা যৌনজীবনের শেষ পর্যন্ত দিতে হবে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের মধ্যে জরায়ুমুখের এইচ পি ভাইরাস দশকওয়ারি সংক্রমণের হার ৩০ বছর থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত মোটামুটি একই রকমের। ৩০-৩৯ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৮ শতাংশ, ৪০-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদেরক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ, ৫০-৬০ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ। সুতরাং নয়-দশ বছর বয়স থেকে অন্তত ষাট বছর বয়স পর্যন্ত বুস্টার দিয়ে যেতে হবে; প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বুস্টার মানে অন্তত দশটি বুস্টার ইঞ্জেকশন।

'নতুন' ভ্যাকসিন বনাম 'পুরানো' প্যাপ টেস্ট

১৯৫৫ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে আমেরিকায় শুধুমাত্র নিয়মিত প্যাপ টেস্ট চালিয়ে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের হার ৭৪ শতাংশ কমানো গিয়েছে। এবং যেহেতু 'গার্ডাসিল' বা 'সার্ভারিক্স' যেসব এইচ পি ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম সে সব ভাইরাস মোট জরায়ুমুখ ক্যান্সারের মাত্র ৭০ শতাংশ-এর কারণ, তাই **তাত্ত্বিকভাবেই এ দুটি ভ্যাকসিনের সফলতার সর্বোচ্চ হার ৭০ শতাংশ, যা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত প্যাপ টেস্টের সফলতার হারের চাইতে কম।** অথচ মাত্র ২০০ টাকায় প্যাপ টেস্ট করিয়ে নেবার প্রকল্প নিয়ে ভারতে সরকারি-বেসরকারি কোনও ক্ষমতাশালী মহল থেকেই কোনও কার্যকর প্রচেষ্টা নেওয়াই হয়নি। কেন? প্যাপ টেস্টে রোগী ছাড়া কারোরই কোনও বড় অঙ্কের লাভের সম্ভাবনা নেই বলেই কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু বলেছে আমাদের দেশে এই পরিকাঠামো নিয়েই যদি সদর্থক চেষ্টা করা যায় তো প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীদের দিয়ে 'ভি আই এ' (ভিস্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসেটিক অ্যাসিড) নামক প্রায় নিখরচার পরীক্ষার সাহায্যে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের হার ৬৭ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ কমানো সম্ভব। এবং খুব জরুরী কথাটা হল, যাঁরা ভ্যাকসিন নিচ্ছেন তাঁরাও কিন্তু জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে পুরো মুক্তি পাচ্ছেন না, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঝুঁকি তাঁদেরও থাকছে। সুতরাং তাঁদেরও নিয়মিত প্যাপ টেস্ট বা 'ভি আই এ' ইত্যাদি করা দরকার। যদি ভ্যাকসিন নিয়ে তাঁদের মনে মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয় তাহলে তাঁরা এইসব টেস্ট করবেন না, ফলে সর্বনাশ তাঁদেরই।

প্রাণের মূল্য, না লাভের অঙ্ক?

একবার ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কোম্পানির সম্ভাব্য লাভের অঙ্কটা দেখে নি। আগেই আমরা হিসেব করে দেখেছি তিনটি প্রাথমিক ডোজ ও দশটি বুস্টার ডোজ, মাথাপিছু এই তেরোটি ইঞ্জেকশন লাগছে। প্রতিটি ইঞ্জেকশনের দাম তিন হাজার করে হলে তেরটি ইঞ্জেকশনের মোটামুটি চল্লিশ হাজার টাকা। মনে রাখবেন, এদেশে এখনও ৫০ শতাংশ শিশু কার্যকর, প্রমাণিত ও জীবনদায়ী ভ্যাকসিন ডি পি টি (ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাসের টিকা) পায় না সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অর্থাভাবের ও অব্যবস্থার কারণে। প্রতিটি ডি পি টি টিকার দাম তিন থেকে পাঁচ টাকা। সেখানে পঞ্চাশ কোটি মহিলার প্রত্যেককে টিকা দেবার ব্যয়ভার নিশ্চয় সরকার বহন করবে না। আর যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে সবাইকে 'গার্ডাসিল' বা 'সার্ভারিক্স' দেবার ব্যবস্থা করাও যায়, এবং যদি কারোরই কোনও রকম পার্শ্বক্রিয়া না হয় (যা অসম্ভব, তবু ধরে নিই তর্কের খাতিরে) তাহলে তার 'লাভ-ক্ষতির খতিয়ান'টা কেমন দেখাবে?

জরায়ুমুখ ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি মোটামুটিভাবে এইরকমঃ বিনা চিকিৎসায় রেখে দিলে প্রতি বছরে মোট জনসংখ্যার ১০,০০০ জনের (মহিলা) মধ্যে ২.৫ জনের মৃত্যু হয়। যদি নতুন টিকা সবাইকে জরায়ুমুখ ক্যান্সার থেকে পূর্ণতম সুরক্ষাও দেয়, তাহলে একজন মহিলাকে বাঁচাতে ৪,০০০ জনকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। খরচ? ৪০,০০০ টাকা দিয়ে ৪,০০০ মহিলার প্রত্যেকে টিকা দিলে মোট খরচ দাঁড়ায় ১৬০,০০০,০০০ টাকা। **১৬০ মিলিয়ন টাকায় একটি জীবন, যেখানে ডায়ারিয়াতে স্রেফ নুন-চিনির জলের অভাবে প্রতি বছর মরে লক্ষ লক্ষ শিশু!** আমাদের কোনও কোনও বন্ধু কমসম করে হিসেব করে বলেছেন, ১৬০ মিলিয়ন নয়, মাত্র ৭৫ মিলিয়ন টাকাতেই বাঁচবে একটি জীবন।

বাঁচবে না হয় একটি জীবন, মরবে ক'টি? আমেরিকার ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া মনিটর করে যে সংস্থা, তার হাতে ২০০৬ -২০০৯ সালের মধ্যে আমেরিকাতে যে ২৩ মিলিয়ন ডোজ প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে ১২০০০ এর ওপর পার্শ্বক্রিয়ার ঘটনা ধরা পড়েছে। সামান্য পার্শ্বক্রিয়ার কথা হিসেবে আনছি না। মারাত্মক পার্শ্বক্রিয়ার সংখ্যা ৭৭২ টি, এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৩২।

২০০৬ -২০০৯ সালের মধ্যে আমেরিকাতে যে ২৩ মিলিয়ন ডোজ প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে ১২০০০ এর ওপর পার্শ্বক্রিয়ার ঘটনা ধরা পড়েছে। মারাত্মক পার্শ্বক্রিয়ার সংখ্যা ৭৭২ টি, এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৩২।

আর আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-প্রতিমন্ত্রী ২০১০ সালের ১৬ এপ্রিল লোকসভায় বিবৃতিতে বলেন, PATH নামক এক আন্তর্জাতিক এন জি ও-র তত্ত্বাবধানে ভারতে 'গার্ডাসিল' ও 'সার্ভারিক্স' পরীক্ষামূলক ভাবে দেওয়া হয়েছিল। সেই ট্রায়ালে অন্ধ্রপ্রদেশের ১৪,১০৯ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪ জন মারা গেছেন, আর গুজরাটে ১০,৬৮৬ জনের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় বিচলিত হবার ফলে ট্রায়ালটি বন্ধ করে দেওয়া হল, জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এবারে যদি আমরা বলি, জরায়ুমুখ ক্যান্সার ঠেকানোর নাম করে এই যে এইচ পি ভি ভ্যাকসিনগুলি আসছে, সেগুলি রোগীর স্বার্থে নয়, কোম্পানির স্বার্থে, তবে কি আমাদের অনৃতভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে? ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. চঞ্চলা সমাজদার, এম বি বি এস, ডি জি ও, স্ত্রীরোগ বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ।
তিনি হাওড়ায় শ্রমজীবি মানুষের এক নিজস্ব ক্লিনিকে যুক্ত আছেন।

Colour page

ডায়রিয়ার দু-চার কথা ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ

Colour page

বিজ্ঞাপন

Colour page

‘স্বাস্থ্যের বৃত্তে’ পত্রিকা উদ্বোধন

Colour page

ত্বক বিশেষজ্ঞের মুখোমুখি ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

চিকিৎসা-বিতর্ক

ক্যান্সার চিকিৎসা : পরীক্ষা, প্রতিশ্রুতি ও মুনাফা

ক্যান্সার নিয়ে মানুষের মনে আতঙ্কের শেষ নেই। একদিকে আতঙ্ক তাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, অন্যদিকে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা আতঙ্ক ভাঙ্গিয়ে দুপয়সা কামানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা চলছে, বিজ্ঞানের নাম করে লোককে ভয় দেখিয়ে, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ-অপারেশনের জালে জড়িয়ে দেবার। কিন্তু মুশকিল হল কোন্ কোন্ পরীক্ষা করা যে বিজ্ঞানসম্মত, কোনখানে ওষুধ-অপারেশন প্রাণ বাঁচায়, আর ঠিক কোন্ সীমানা পেরিয়ে গেলে তা বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা না হয়ে মুনাফার আরাধনায় পরিণত হয়, সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বিস্তর। এমনই একটা বিতর্কিত ক্ষেত্র হল, প্রস্টেট ক্যান্সার দ্রুত ধরতে রক্তে 'প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন' (Prostate Specific Antigen - সংক্ষেপে PSA বা পি এস এ) মাপার গুরুত্ব। পুরুষ মানুষের মূত্রথলির ঠিক নীচে তলপেটের ভেতরে থাকে প্রস্টেট গ্রন্থি। তার ক্যান্সার রোগ হলে শরীরে রোগ লক্ষণ ফুটে ওঠার আগেই রক্তে পি এস এ-র পরিমাণের বৃদ্ধি দেখে সে ক্যান্সারকে তাড়াতাড়ি ধরা যায়, এবং সেই সময়ে চিকিৎসা করে প্রাণ বাঁচানো যায় -চিকিৎসক মহলে এমন ধারণা চলছে বহুদিন। **সেই ধারণাটিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন ড. তুষার চক্রবর্তী**।

দুনিয়ায় একদিকে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকায় রোগটি এক মহামারীর আকার ধারণ করেছে, অন্যদিকে, তাকে রুখবার জন্য বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসার এক বিরাট কর্মকান্ড। চারিদিকে এখন তাই ক্যান্সার নিরাময়ের প্রতিশ্রুতির ছড়াছড়ি। তবু, এত হৈ-হৈ রৈ-রৈ কান্ড ঘটিয়েও যে কঠোর বাস্তব সত্যকে কোনও মতেই চাপা দেওয়া যাচ্ছেনা তা হল - ক্যান্সার গবেষণা জ্ঞানের বিপুল বৃদ্ধি ঘটালেও ক্যান্সার নিরাময়ের কর্মকৃতিত্বে তা মোটের ওপর ব্যর্থ। বরং, সুযোগ বুঝে নিরাময় ও নিরাপত্তা যোগাবার নামে নানা রকম ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা এই চিকিৎসা-ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ যেন দখল করে নিচ্ছে। তলায় তলায় এমন একটা বক্রোক্তিও চালু হয়ে গেছে যে ক্যান্সার যত মানুষের প্রাণ নিচ্ছে বা ক্ষতি করছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লোককে তা বাঁচিয়ে রেখেছে, যোগাচ্ছে মুনাফা। শুধু বড়লোক বা মধ্যবিত্তরাই যে ক্যান্সার চিকিৎসার নামে এমন উচ্চমূল্যের উচ্চপ্রযুক্তির ছলনার শিকার হচ্ছেন তা নয়; কিছু চালবাজ বা আধা উন্মাদ হাতুড়ে গরীবদের কাছ থেকেও শেষ সম্বল কানাকড়ি যা পাওয়া যায় এই সুযোগে তা লুটেপুটে নিচ্ছে। অল্পকিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, সব মিলিয়ে দেখতে গেলে এটাই হল ক্যান্সার চিকিৎসার হালের চেহারা।

ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসায় উচ্চপ্রযুক্তির সূত্রপাত ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সে দেশে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্স্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে, এবং ১৯৪৪ সালে পাবলিক হেলথ সার্ভিস অ্যাক্টে ক্যান্সার গবেষণাকে জনস্বাস্থ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এই গবেষণায় সরকারি অনুদান যোগাবার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে সেই ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাক্ট আবার নতুন করে তৈরি করা হয় যাতে এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মুখ্য দিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তখন থেকে আমেরিকায় জনস্বাস্থ্যের এক নম্বর এজেন্ডা হয়ে ওঠে ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসা প্রযুক্তি। দাবী করা হয়, এক দশকের মধ্যে সবরকম ক্যান্সার তাঁরা কোনও এক ম্যাজিক বুলেটে খতম করে ছাড়বেন। এই লগ্নী ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রটিতে একদিকে যেমন মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে উচ্চপ্রযুক্তির নামে বুজরুকির শীর্ষেও উঠে এসেছে আমেরিকা। ফলে সবার আগে সেদেশেই পঙ্গু হয়ে গেছে সাধারণ নাগরিকদের অন্যান্য রোগের চিকিৎসার সুযোগ, যে সব আরো সহজে, কম খরচায় করা যেতে পারত। এবং দেখাদেখি এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়ায়। আমেরিকাই দেখিয়েছে ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে মুনাফা আদায়ের কল তৈরির পথ। ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রেও ব্যর্থ ও ক্ষতিকর রাসায়নিকগুলোকে পরীক্ষামূলক ওষুধ হিসেবে উচ্চমূল্যে সাময়িকভাবে বিক্রি করা ও ক্যান্সার রোগীদের ওপর প্রয়োগ করার ছলনা এখন হয়ে উঠেছে বড় বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির রুটিন কাজ। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জিন দেখে আপনার ক্যান্সার হবে কিনা সেই ভাগ্য বলে দেবার আরেক খেল। মার্কিন অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ায় তাদের এই সব মৌলিক অসঙ্গতি আজ দ্রুত প্রকট হয়ে উঠেছে। জনমত ও জনরোষ কোনও মতেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে নীতির দিকে তাই এখন শুরু হচ্ছে মোড় ঘোরার পালা। **ক্যান্সার পরীক্ষার নামে প্রায় সর্বসাধারণকে উচ্চমূল্যের ও কার্যত অকেজো জিন ও অন্যান্য পরীক্ষা করবার প্রয়োজন সত্যিই আছে কিনা সেই দাবী সরকারি সংস্থার তরফ থেকেই তোলা শুরু হয়েছে।** আর মুখ্যত সেই নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

মেয়েদের স্তনের ক্যান্সার এবং পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সার হবার প্রাথমিক সম্ভাবনা জনসমাজে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বিরাজ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির উপকরণের পাশাপাশি থাকে তাদের চাপা দেবার হরেক উপকরণ ও কৌশল। দুটোর পেছনেই বহুসংখ্যক জিন অবস্থাভেদে ছোটবড় ভূমিকা পালন করে। কোষের ভেতরের উপকরণের পাশাপাশি বাইরের পরিবেশের ভূমিকাও থাকে প্রায় সমান সমান। এবং দেহের নানা রকমের কোষে ক্যান্সার-সৃষ্টির গতিবিধি নানা রকমের পথ বেছে নেয়। তবে এই স্তন ক্যান্সার ও প্রস্টেট ক্যান্সার - এ দুটোই অনিয়ন্ত্রিত স্থানীয় কোষবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মাথা চাড়া দেয়। আর তখন তা নানাভাবে নিজেকে জানান দিতে শুরু করে। সতর্ক থাকলে শল্যচিকিৎসা, বিকিরণ বা কোষঘাতী ওষুধ প্রয়োগে বাড়তে থাকা টিউমারকে বাদ দিয়ে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি উপশম আনা যায়। তবে আক্রান্তদের একটা ছোট অংশে তা সামলানো যায় না। একটা হিসেবে দেখা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ২০১০ সালে ৩২,০৫০ জন পুরুষ প্রস্টেট ক্যান্সারে মারা গেছেন। ত্বকের ক্যান্সার-এর পরেই মারণ রোগ হিসেবে জায়গা নিয়েছে প্রস্টেট ক্যান্সার। আর তার ফলে প্রস্টেট পরীক্ষাকে গোটা পুরুষজাতির ওপর ঢালাওভাবে সুপারিশ করার ফাঁদ পাতা হয়েছে দেশ জুড়ে। ইতিপূর্বে মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকমটা করা হয়েছে স্তনের ক্যান্সারের ভয় দেখিয়ে। এর ফলে ক্যান্সার হাসপাতাল মালিকদের হয়েছে পোয়াবারো। এবং অবশেষে সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

প্রস্টেট বৃদ্ধির অন্যতম সাধারণ লক্ষণচিহ্ন হল রক্তে প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন বা পি এস এ-র মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু এর সামান্য কমা-বাড়া ক্যান্সার ছাড়া অন্যান্য আরও কারণেও ঘটতে পারে। সুস্থ পুরুষদের ক্যান্সারের অন্য কোন লক্ষণ না থাকলেও পি এস এ পরীক্ষা করিয়ে তাদের প্রস্টেট ক্যান্সারের পূর্বাভাষ জানার ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দপ্তর ইউনাইটেড স্টেটস প্রিভেনটিভ সার্ভিস টাস্ক ফোর্স। অযথা স্বাস্থ্য রক্ষার নামে নিছক লোকঠকানো ব্যবসা বন্ধ করা যাদের ঘোষিত লক্ষ্য। যদিও এটা খসড়া প্রস্তাব, তবু এই রিপোর্ট বার হবার আগেই এই নিয়ে

রীতিমতো শোরগোল বেঁধে গেছে। ওবামা প্রশাসন সকল নাগরিককে ন্যূনতম স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ তার হাতে টাকা নেই। ফলে স্বাস্থ্যখাতে এই জাতীয় সরকারি টাকার বাজে খরচ কমিয়ে দেবার পথ তাকে বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে। যদিও, এটা একচেটিয়া কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের শক্তিশালী ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার শামিল। **এই ব্যবসায়ীরা রিপাবলিকানদের হাত করে টাস্ক ফোর্সের এই সিদ্ধান্তকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরিষেবার 'র‍্যাশনিং' আখ্যা দিয়েছে।** এদের তরফে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানানো শুরু হয়ে গেছে। এতদিন একথা অবিরাম প্রচার করা হতো যে পি এস এ পরীক্ষা করানো প্রস্টেট ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়। হেলথ ইন্সিউরেন্স এ-পরীক্ষার ঢালাও অনুমতি দিয়েছিল। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরাও এতে সায় দিতেন। এ সব কথা শুনতে শুনতে লোকের এ সব কথার ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে। এখন টাস্ক ফোর্স একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে ঐ সব প্রচার কতদূর ভুল। নিছক যুক্তিতর্ক নয়, টাস্ক ফোর্স তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঁচদফা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালিয়ে দেখেছে যে পি এস এ পরীক্ষা প্রস্টেট ক্যান্সার-জনিত মৃত্যু কমাতে তো পারেই না, বরং অকারণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মানুষের ক্লেশ বাড়ায়। নিছক পি এস এ পরীক্ষার ফলে বন্ধ্যাত্ব, মূত্রের বেগ ধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা, এই সব সমস্যা প্রায়শ ঘটতে দেখা গেছে। সুতরাং, হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে পুরুষদের ওপর ঢালাও হারে পি এস এ পরীক্ষায় লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক অনেকটাই বেশি। ধরা পড়ে গেছে, এতদিন এ সব প্রমাণ স্বার্থপর ভাবে চেপে রাখা হয়েছিল।

পঞ্চাশ বছরের ওপর যাঁদের বয়স এমন পুরুষদের পি এস এ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে করালে কোনও সুফল পাওয়া যায় কিনা সেটা টাস্ক ফোর্সের অনুমোদিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা চিকিৎসা পরীক্ষায় নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে দেখা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এমন মানুষের সংখ্যা ৪.৪ কোটি। এঁদের মধ্যে ৩.৩ কোটি পরীক্ষা করিয়েছেন। অনেকেই এ বিষয়ে অবহিত নন। তাঁদের রুটিন চিকিৎসা বা যাচাই, যা যা ইনসিওরেন্স কোম্পানি বাধ্যতামূলক ভাবে করাতে বলে তার মধ্যে থাকায় তাঁরা এ সব চোখ বুঁজে করিয়ে নিয়েছেন। এ সব প্রয়োজনীয় কিনা তা ভাববার স্বাধীনতা তাঁদের হাতে ছিল না। বাদ বাকি ১.১ কোটিকেও বাধ্যতামূলক পি এস এ পরীক্ষা করাবার জন্য চাপ তৈরি করা হচ্ছিল। এবং সেই সূত্রেই আমেরিকার স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা দপ্তর এই পরিষেবার মান নির্ধারণ করার ব্যাপারটা দেখতে গিয়ে টাস্ক ফোর্সকে এ কাজে নামতে বলে। আর তাতেই হিতে বিপরীত ঘটার প্রমাণ হাতে এল।

কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মুশকিল বেড়ে গেছে এই কারণে যে এতদিন এঁরা ইউনাইটেড স্টেটস প্রিভেনটিভ সার্ভিস এই সরকারি দপ্তরটিকে মাথায় তুলে নাচতেন। এই দপ্তরও নতুন নতুন উন্নততর প্রযুক্তির পক্ষে দাঁড়াত। ফলে চিকিৎসার খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। নাগরিকদের আয়ের একটা বড় অংশ এভাবে স্বাস্থ্যপরিষেবার নামে হাপিস করা হত। অর্থনীতি বেসামাল হবার পর চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে লাগল। এই গোলমেলে সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ওবামা। তিনি সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করতে চান। এবং সেই জন্য চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের

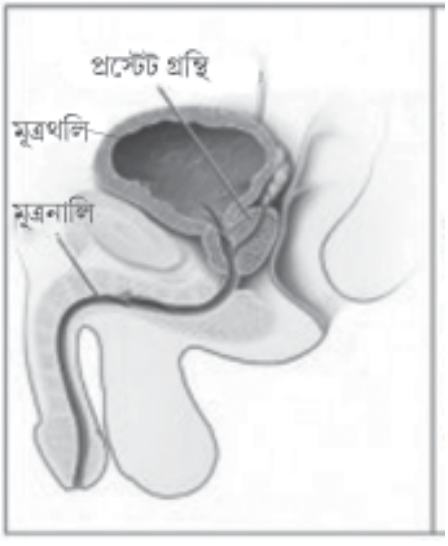

জন্য কোনটা প্রয়োজন এবং কোনটা বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় তা ঝাড়াই বাছাই করতে হচ্ছে। **২০০৯ সালে টাস্ক ফোর্স চল্লিশোর্ধ সমস্ত মেয়েদের নিয়মিত ম্যামোগ্রাফি করা নিষ্প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হল, কোনও উপসর্গ ছাড়া এটা সকলের ওপর চাপালে লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই হবে বেশি।** এ নিয়েও তখন হৈ-চৈ বেঁধেছিল। তবে পরে তা থিতিয়ে যায়। এবার পি এস এ নিয়ে বিতর্ক আরো জোরদার হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একটি কারণ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এগিয়ে আসছে। ভোটের রাজনীতি এই তর্ককে আরো ঘোলা করে তুলবে। প্রস্টেট ক্যানসার আছে এবং চিকিৎসায় সুফল পেয়েছেন, এমন তারকাদের রিপাবলিকানরা মঞ্চে তুলে ওবামাকে কোনঠাসা করবেন। বেসবল তারকাসহ এমন অনেকে এর মধ্যে এই কাজে নেমেও পড়েছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে ড্রাগ-ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা, এবং নামকরা অনেক চিকিৎসক। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের হিসেবকে এই সব ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর দিয়ে চাপা দেবার বিজ্ঞাপনী কায়দা আমরা মনে হয় শীঘ্রই দেখতে পাব।

যদিও ওবামা ও টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্তকে বিরুদ্ধপক্ষ চিকিৎসার রেশনিং বলে কালো দাগে দেগে দিচ্ছেন, কিন্তু সত্যি ঘটনা হল— টাস্ক ফোর্স তার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে চিকিৎসা-খরচকে একেবারেই গণনায় আনেনি। এই তুলনা টানা তাই যুক্তিহীন। পাইকারিভাবে পি এস এ পরীক্ষার কার্যকারিতাই কেবল খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে আল্ট্রাসাউন্ড ও ডিজিট্যাল রেক্টাল এগজামিনেশন থেকে এ-পরীক্ষায় যে চিকিৎসার সুবিধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটেনা, এটাই প্রমাণিত হয়েছে। কারো প্রস্টেট ক্যান্সার হবে কিনা তা এই পরীক্ষা করে ক্যান্সার ঘটার আগে মোটেই বোঝা সম্ভব নয়। কেউ মূত্রের বেগ ধারণ করতে পারছেন না দেখে তাঁকে এই জাতীয় পরীক্ষা করতে বলা যে অনুচিত সেটা এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য নামজাদা চিকিৎসকেরা সকলেই এখন একবাক্যে স্বীকার করছেন। টাস্ক ফোর্স অবশ্য ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সের পুরুষদের রক্তে পি এস এ মাপাকে সব ক্ষেত্রেই একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়নি। রক্তে হঠাৎ পি এস এ বাড়তে শুরু করলে প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেকটাই বোঝা যায়। কিন্তু হিসেবে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অবস্থায় প্রস্টেট ক্যান্সার কোষ অবদমিত অবস্থায় থাকে। এবং খুব অল্পসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই ক্যান্সার হঠাৎ ছড়াতে থাকে। মুশকিল হলো - ঐ দ্রুত ছড়িয়ে পড়া প্রস্টেট ক্যান্সার নিরাময় করার মত ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু এখনো আমাদের হাতে নেই। যদিও সেই মিথ্যে আশা দেখিয়েই আরও যন্ত্রণাদায়ক নানা রকমপরীক্ষা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ না জেনে এদের ওপর ভরসা রাখছে। বাড়ছে বায়োপ্সির ব্যবহার। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পি এস এ পরীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৮৬ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে ১০ লক্ষ মার্কিন নাগরিকদের ওপর সার্জারি, রেডিয়েশন থেরাপি বা দুটোই চালানো হয়। পি এস এ পরীক্ষা না করালে এ সব করার সুযোগ তৈরি হত না। এটাই টাস্ক ফোর্স তুলে ধরেছে। দেখেছে যে এই ১০ লাখের মধ্যে ৫ হাজার জন শল্যচিকিৎসার

অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেছেন। আরো ১০ থেকে ৭০ হাজার জন কোনও না কোনও চিকিৎসাঘটিত অসুস্থতার কবলে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মানুষের বীর্যের সঙ্গে রক্তক্ষরণ ঘটতে দেখা গেছে। ২ থেকে ৩ লাখ মানুষ এর ফলে পুরুষত্ব হারিয়েছেন। এই পরীক্ষার যিনি উদ্ভাবক সেই ডক্টর রিচার্ড অ্যাবলিন এসব খুঁটিয়ে দেখে নিজেই বলেছেন যে নির্বিচারে এই পরীক্ষা করা নিছক জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয় (পাবলিক হেল্‌থ ডিজাস্টার) ডেকে এনেছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে পি এস এ পরীক্ষা করিয়েছেন ২ লাখ ১৭ হাজার ৭৮০ জন, আর প্রস্টেট ক্যান্সারে মারা গেছেন ৩২ হাজার ৫০ জন। মনে রাখতে হবে যে ৫০ বছরের আগে পুরুষদের এই রোগ হয় না বললেই চলে, এবং প্রস্টেট ক্যান্সারে বেশির ভাগ রোগী মারা যান ৭৫ বছরের বেশি বয়সে। অটোপ্সিতে দেখা গিয়েছে যে ৪০-৬০ বছর বয়সি পুরুষদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ প্রস্টেট ক্যান্সার বহন করেন। এই হার বাড়তে বাড়তে ৮৫ বছরে তিন-চতুর্থাংশকে ছুঁয়ে ফেলে। আর পি এস এ পরীক্ষা সব চাইতে বেশি মানুষ করান ৭০ বছরে, যখন পরীক্ষায় তা ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশি। অথচ **নিরাময়ের কোনও নির্ভরযোগ্য পথ নেই। যে সব চিকিৎসা তাঁরা করান, তাতে বাকি জীবন বরং নানা উপসর্গে জেরবার হতে হয়।** সুতরাং, সবদিক দেখে টাস্ক ফোর্স বলেছে যে আপাতত প্রস্টেট ক্যান্সার হবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। কিছু না করাই ভালো।

এই পি এস এ পরীক্ষার সবচাইতে বড় দুটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয় ইউরোপ ও আমেরিকায়। ইউরোপের ট্রায়ালে ৭ টি দেশে ১ লাখ ৮২ হাজার মানুষ অংশ নেন। দশ বছর ধরে লক্ষ্য রেখে দেখা যায় যে পরীক্ষা করা না করার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। মানে, পরীক্ষা করে কোনও সুফল অর্জিত হয় না। আমেরিকার বড় ট্রায়ালটিতে ৭৬,৬৯৯ জন অংশ নেন। সেখানেও ফল হয় ইউরোপের মতনই। বৃটেনের ন্যাশনাল ইনস্টিউট অব হেল্‌থ অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল একসেস-এর চেয়ারম্যান ডক্টর মাইকেল রডলিনস জানিয়েছেন যে বেশ কিছু বছর আগে তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর পি এস এ পরীক্ষা করানো হয়, যাতে কিছু ধরা পড়ে না। এখন তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন এই ভেবে যে পরীক্ষার ফল পজিটিভ হলে তাঁকে কত নাকাল হতে হত। আবার প্রস্টেট কেয়ার ফাউন্ডেশনের একজন মুখপাত্রের অভিজ্ঞতা ঠিক এর বিপরীত। তিনি মনে করেন যে পরীক্ষার ফলে তিনি শল্যচিকিৎসা করান বলেই বেঁচে আছেন। আমেরিকার মেডিক্লেম এবং প্রাইভেট হেলথ ইনসিওরেন্স মহল এ নিয়ে টাস্ক ফোর্সের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

তবে **টাস্ক ফোর্স-এর সিদ্ধান্তকে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেবার মতাদর্শ বলে যদি কেউ ধরে নেন তো তিনিও ভুল করছেন।** টাস্ক ফোর্স সরব হয়েছে অকেজো পরীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা আদায় করা ও মানুষের দুর্ভোগ বাড়াবার বিরুদ্ধে। সু-চিকিৎসার পথ বন্ধ হোক তাঁরা তা মোটেই চান না। টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিউস্টনের বেলর কলেজ অব মেডিসিনের শিশুচিকিৎসক তাই জানিয়েছেন যে তাঁরা চান এই অকেজো পি এস এ পরীক্ষা বন্ধ হোক, যাতে সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য রোগের পূর্বাভাষ দেওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উচিত সেই চ্যালেঞ্জ লুফে নেওয়া। মুনাফাশিকারী ধান্দাবাজদের খপ্পর থেকে নিজেদের মুক্ত করাটাও সেই কারণেই আরও জরুরী।

আমেরিকার অর্থনৈতিক ধ্বস না ঘটলে এসব সহজে ধরা পড়ত বলে হয়না। অর্থনীতি আর সমাজের বিভিন্ন ঘটনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্দরমহলকে যে কিভাবে প্রভাবিত করে তার একটা নমুনা হল পি এস এ পরীক্ষার পূর্ণমূল্যায়ণ। যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানকে কেবলমাত্র একটি বিশুদ্ধ সত্যান্বেষণের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চান, এ ঘটনা তাঁদের প্রায় সবারই মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে। পুঁজিবাদ ধ্বংস হলে তার সঙ্গে আরও বহু পাপ যে সমাজ থেকে বিদায় নেবে, সেটাও এখন ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ❑

লেখক পরিচিতি : জন্ম ১৯৫৮, পেশায় অণুজীববিজ্ঞানী। পি এইচ ডি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম ডি অ্যান্ডারসন ক্যান্সার সেন্টারে অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশে ফিরে ১৯৯৩-এ ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজিতে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন, এবং সেখানেই বর্তমানে প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট। মাঝখানে কিছুদিন ইউনির্ভাসিটি অব ম্যাসাচ্যুশেট এবং লুইসিয়ানা স্টেট ইউনির্ভাসিটিতে ভিজিটিং ফেলো হিসাবে কাজ করেছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের আন্তর্সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে কাজ ও লেখালেখি করেন। বাংলায় প্রকাশিত বই **জিন: ভাবনা-দুর্ভাবনা**। e-mail: chakraborty.tushar@gmail.com

ক্যুইজের উত্তর

১. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, ১৯২৮ সালে।

২. অ্যাপেনডিক্স।

৩. হিমোফিলিয়া। রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর এইট-এর অনুপস্থিতি এর কারণ।

৪. মাইকোব্যাকটেরিয়া ট্যুবারকুলোসিস।

৫. ০.৫-০.৮ মিলিগ্রাম/ লিটার।

৬. ১৯৮০ সালের ৮ই মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটি বসন্ত নির্মূল ঘোষণা করে। শেষ রোগীটি পাওয়া যায় ১৯৭৭ সালে সোমালিয়াতে ২৬ শে অক্টোবর।

৭. ১৪ ই নভেম্বর।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

গুটি বসন্ত রোগী

ড্যাকটিলোগ্রাফি

৮. ট্রিপানোসোমা ব্রুজি নামক জীবাণু সিসি মাছির দ্বারা পরিবাহিত হয় ও মানুষকে আক্রান্ত করে।

৯. দীর্ঘদিন খেসারির ডাল খেলে স্নায়ুজনিত কারণে ক্রমে রোগী চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে, একেই নিউরোল্যাথিরিসম বলে। রাসায়নিকের নাম বিটা অক্সালিল অ্যামিনো অ্যাসিড — BOAA।

১০. আফ্রিকার তানজানিয়াতে ১৯৫২ সালে। এই রোগে খুব তাড়াতাড়ি শরীরের হাঁটু গোড়ালি ইত্যাদি বড় গাঁটগুলো ফুলে খুব ব্যথা হয়ে রোগী কুঁকড়ে বেঁকে যায়। চিকুনগুনিয়া শব্দটির অর্থ বেঁকে বা ঝুঁকে যাওয়া।

১১. Acquired Immuno Deficiency Syndrome

১২. একটি আমলকিতে ৬০০ মিগ্রা ভিটামিন সি থাকে যা অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে অনেক বেশি।

১৩. ড্যাকটিলোগ্রাফি।

১৪. অ্যান্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট।

১৫. মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস-এর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্মরণে: বিজন ষড়ঙ্গী

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী **বিজন ষড়ঙ্গী** আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতিতে তাঁর পরিবেশভাবনা বিজ্ঞানভাবনা স্বাস্থ্যভাবনা এখনও বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য নিয়ে, স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশ দূষণের মারাত্মক প্রভাব নিয়ে আজ আমাদের যেটুকু সচেতনতা, তার জন্য আমরা প্রয়াত বিজন ষড়ঙ্গীর কাছে ঋণী- **লিখছেন ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।**

বিজনদার সঙ্গে আমার খুব ভাল করে পরিচয় হল ওঁর মৃত্যুর পর। পাঠক, অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, মৃত্যুর পর আবার পরিচয় কী? আমি কি বস্তুবাদ-বহির্ভূত কোনও কথা বলছি? না, একেবারেই নয়। আমি বলছি, বিজনদার সঙ্গে পরিচয় মানে তাঁর সারা জীবনের কাজের সঙ্গে পরিচয় ... কত কত কাজ বিজনদা যে তাঁর ৪৩-৪৪ বছরের জীবনে করেছেন তা একসঙ্গে খুঁটিয়ে দেখলাম তাঁর মৃত্যুর পর। আর তখনই ভাল করে পরিচয় হল এই মানবদরদী বিজ্ঞানকর্মীর সঙ্গে।

আক্ষরিক অর্থে বিজনদার সঙ্গে, 'টপ কোয়ার্ক' পত্রিকার সম্পাদক বিজন ষড়ঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঠিক কবে কিভাবে হয়েছিল বলা শক্ত। দেখা হয়েছিল কয়েকবার, তবে কথা হয়েছিল টেলিফোনে অনেকবার। কথা হ'ত কী নিয়ে? কথা মূলত হ'ত 'টপ কোয়ার্ক' পত্রিকা আর বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে .... তখনই পরিচয় ঘটেছিল এক জন মানুষের সঙ্গে যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উদ্দেশ্য মানুষের ভাল করা। আর যদি তা না হয়ে ওঠে তবে তাকে মানবমুখী করার দায়িত্ব সমস্ত বিজ্ঞানকর্মী আর সমাজকর্মীর।

সেই দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিজন ষড়ঙ্গী। ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় বের হয় 'কোয়ার্ক' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা। **প্রথম দিকের 'দ্বিমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা' পরে আক্ষরিক অর্থেই 'গণবিজ্ঞান পত্রিকা'য় রূপান্তরিত হয়েছিল। বিজন ষড়ঙ্গীর সম্পাদনায় এই পত্রিকায় মোট ষাটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।** এর মধ্যে শেষটি বেরোয় তাঁর মৃত্যুর পরে আর বাকি ৫৯টি তিনি নিজের হাতে বের করে-ছিলেন। এই ৫৯ টি সংখ্যার মধ্যে প্রথম ১৬ টি প্রকাশিত হয়েছিল 'কোয়ার্ক' নামে (১৯৯২-'৯৪); ১৯৯৫-এ পঞ্জীকরণের প্রয়োজনে পত্রিকা পরিবর্তিত হয়ে হয় 'টপ কোয়ার্ক'। বিজনদা যে ৫৯ তম সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলেন তা বের হয় ২০০৫-এ। আর ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর সহযোদ্ধারা যে শেষ ৬০তম সংখ্যা প্রকাশ করেন তা বের হয় ২০০৯-এ। দেড় দশক জুড়ে প্রকাশিত হওয়া এই পত্রিকায় কী ছিল যে তা নিয়ে এতদিন পরে আমরা আলোচনা করছি... উদ্বেলিত হচ্ছি?

বিজন ষড়ঙ্গী
(১৭/০৮/১৯৬৩ - ২২/০৫/২০০৭)

'কোয়ার্ক' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ একটা সাধারণ বিজ্ঞান পত্রিকা হিসাবে যার বিষয় ছিল আইনস্টাইন-এর বিখ্যাত সমীকরণ, $E = mc^2$। এরপর বের হয় 'মৌলকণা লেপ্টন ও কোয়ার্ক'। তবে এই 'কোয়ার্ক পর্যায়ে' বিজনদা এর বিষয়কে শুধুমাত্র মৌল বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বিষয় স্পর্শ করতে চেয়েছে সমাজকে। তার প্রেক্ষিত কখনও বিশ্ব ('বিপন্ন বিশ্ব মুমূর্ষু মালভূমি', মে-জুন ১৯৯২), আবার কখনও ভারত ('উদ্দালক আরুণি ও সমকালীন ভারতবর্ষ', সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর ১৯৯২)। পরিবেশ নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে একটা স্লোগান ব্যবহৃত হয়, 'থিংক গ্লোবালি, অ্যাক্ট লোকালি', অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভাবনা মাথায় রেখে স্থানীয় স্তরে সক্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়। এই স্লোগান কার্যকর করেছিলেন বিজনদা আর তাঁর 'কোয়ার্ক' পত্রিকা। 'কোয়ার্ক' একরকম আন্দোলনের মুখপত্রই হয়ে ওঠে যখন সেখানে প্রচ্ছদ কাহিনীতে দাবি জানানো হয় 'সংরক্ষিত ঘোষিত হোক কনকদুর্গার জঙ্গল' বা বলা হয় 'ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের ডেজ হাউজ কাম মর্গ একটি মারক ঘর'।

ডিসেম্বর ২০০১-মার্চ ২০০২ সংখ্যার 'টপ কোয়ার্ক'-এ প্রথম লেখা হয় 'গণবিজ্ঞান পত্রিকা'। তবে প্রকৃত অর্থে 'টপ কোয়ার্ক' আগেই গণবিজ্ঞান পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। পত্রিকার পাতায় উদঘাটিত হয়েছিল বারিপদার ঠাকুরানীর জালিয়াতির কাহিনী (এপ্রিল-মে ১৯৯৫)। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত 'বোধনা লীলাবতী শিক্ষাসদন' আজও অব- হেলিত কেন? (ডিসেম্বর ১৯৯৫ - জানুয়রি ১৯৯৬)। তবে 'টপ কোয়ার্ক'-এর সবচেয়ে বড় কাজ বোধহয় চিচুরগেড়িয়ার পাথর খাদান থেকে নিঃসৃত পাথরের গুঁড়ো শরীরে ঢুকে শ্রমিকদের সিলিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁদের জন্য লড়াই। 'টপ কোয়ার্ক' প্রচ্ছদ কাহিনী করে 'সবুজ অরণ্যে মৃত্যু মিছিল' (অক্টোবর ১৯৯৫)। পরে এই

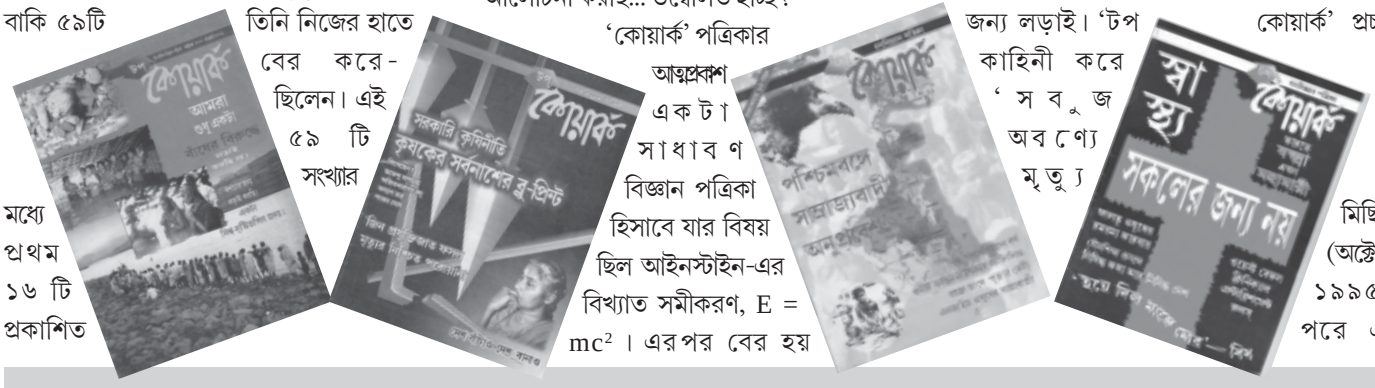

খবর **ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। শুরু হয় লড়াই। আর এই লড়াইয়ের পুরোভাগে যে মানুষটি ছিলেন তাঁর নাম বিজন ষড়ঙ্গী।** লড়াইটার নানান মাত্রা ছিল। একদিকে পরিবেশ বাঁচানো, গরীব শ্রমিকদের দূষণের হাত থেকে বাঁচানো আর অন্যদিকে সিলিকোসিস আক্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লড়াই। এই লড়াইতে জয়ী হলেন বিজনদা। বন্ধ হল পাথর খাদান। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেলেন আক্রান্ত শ্রমিকেরা আর নিহত শ্রমিকদের জন্য সামান্য ক্ষতিপূরণ পেলেন তাঁদের স্বজনরা। ১৯৯৩ থেকে ২০০১ এই দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ে ছিল দু'টি পথ। একটি আইনের, যাতে সহযোগী ছিল 'নাগরিক মঞ্চ' আর অন্যটি গণ আন্দোলনের পথ যেখানে সামনে ছিলেন বিজন আর তাঁর 'টপ কোয়ার্ক'।

দূষণের প্রশ্নে মানুষের জন্য লড়াই এখানেই শেষ নয়। বিজনদা চেষ্টা করেছিলেন বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও অন্যত্র স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে হওয়া ভয়াবহ দূষণ রোধ করতে। শুধু পত্রিকায় লেখা বের করা নয়, সচেষ্ট হয়েছিলেন ব্যাপক প্রচারসহ প্রত্যক্ষ আন্দোলন কর্মসূচী গড়ে তুলতে। করেছিলেন গাছ কাটা বন্ধের লড়াই। একদিকে তা ছিল প্রধানত শাল গাছ কাটা বন্ধের আন্দোলন আর অন্যদিকে তা ছিল নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক -যেমন ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে আধুনিকীরণের নামে গাছ কাটার উদ্যোগের বিরোধিতা। বিজনদার আরও লড়াই ছিল; আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের জন্য লড়াই, ভোপালের বিরুদ্ধে লড়াই, জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য লড়াই। এই লড়াকু মানুষটির লড়াই শুধু ঝাড়গ্রাম শহর বা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা মনে করলে ভুল হবে। স্থানীয় স্তরের এই লড়াই লড়তে গিয়ে বিজনদা কখনও তাঁর বিস্তৃত দৃষ্টি আর ভাবনা হারান নি।

সেজন্যই তিনি 'টপ কোয়ার্ক'-এর এমন সব সংখ্যা বার করেন সমাজমনস্কতার ছাপ যার পাতায় পাতায়, কখনও পত্রিকার পাতায় উঠে আসে 'গ্রাম বাংলার সমস্যা, সাপে কাটা', (ফেব্রুয়ারি-মে ১৯৯৯), কখনও 'হেপাটাইটিস -বি গণটিকাকরণ'-এর হুজুগ (জুন - সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)। একদিকে 'পাখির ভুবন' (এপ্রিল-জুলাই ২০০২) বা 'সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য' (ডিসেম্বর ২০০২ -মার্চ ২০০৩) বিষয়ক সংখ্যা বের করছেন অন্যদিকে দেশ ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তাঁকে ভাবাচ্ছে। 'গুজরাট গণহত্যা'র প্রেক্ষিতে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০০২ -এ বিশেষ সংখ্যা বের হচ্ছে; সম্পাদকীয়তে আগেই বিজন লিখেছেন, 'গুজরাট গণহত্যা - ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ' (এপ্রিল-জুলাই ২০০২)। তার আগে এপ্রিল -মে ১৯৯৮ সংখ্যায় পোখরান বিস্ফোরণের বিরোধিতা করা হয়েছে। পরে এপ্রিল - জুলাই ২০০০- এ বেরিয়েছে পারমানবিক শক্তি-বিরোধী সংখ্যা। স্বাস্থ্য নিয়েও 'টপ কোয়ার্ক' ভাবছিল। আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই বিষয় হয় - 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও পেশাগত রোগ' (ডিসেম্বর ২০০১ - মার্চ ২০০২)। ২০০৩-এর জুন-নভেম্বর সংখ্যার বিষয় ছিল 'বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা' আর তার পরের সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল জনস্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু বিজন ষড়ঙ্গীর এইসব ইস্যুভিত্তিক ভাবনা শুধু নির্দিষ্ট একটা বিষয়কেন্দ্রিক ছিল না। তা ছিল এক সামগ্রিক ভাবনার বিভিন্ন ধারা। আর এই সামগ্রিক ভাবনাটা ছিল উন্নয়ন নিয়ে। সেই কবে অক্টোবর ২০০০-জানুয়ারি ২০০১-এর বিষয় হয়েছিল, নর্মদা বাঁধ বিবর্তনের প্রেক্ষিতে, জীবন বনাম আদালত। বিজ্ঞান আন্দোলনের আবশ্যক অঙ্গ কুসংস্কার বিরোধিতার লড়াইও চলছিল (জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং জ্যোতিষপঠন বিরোধী দুটি সংখ্যা বের হয় যথাক্রমে ১৯৯৯ ও ২০০১-এ)। তবে তার থেকেও বড় কথা মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন কিসে সেই প্রশ্নটা সমানে তোলা হচ্ছিল 'টপ কোয়ার্ক'-এর পাতায়। ডিসেম্বর '০৩-মে '০৪ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিজন লেখেন, 'সম্প্রসারিত জাতীয় সড়কে (এন. এইচ.৬) বাবুদের ফোর হুইলারের দুরন্ত গতি আর অন্যদিকে সর্বস্ব হারানো সহস্র গ্রামবাসী - একে কি উন্নয়ন বলে?'

বিজনদা কি সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন? তখনও এরাজ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা ঘটেনি। এপ্রিল-মে ২০০৩ সংখ্যায় প্রচ্ছদ বিষয় হল : 'ম্যাকিনসের রিপোর্ট ও নতুন কৃষি নীতি : আমাদের উদ্বেগ'; লেখা হ'ল 'রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি সর্বনাশের নীল নক্সা'।

বিজনদা কি সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন? তখনও এরাজ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা ঘটেনি। এপ্রিল-মে ২০০৩ সংখ্যায় প্রচ্ছদ বিষয় হল : 'ম্যাকিনসের রিপোর্ট ও নতুন কৃষি নীতি : আমাদের উদ্বেগ'; লেখা হ'ল 'রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি সর্বনাশের নীল নক্সা'।

আর তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংখ্যায় বের হ'ল - ওদের ক্ষমতা, আমাদের তর্ক,.... বাবু বলিলেন 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে', শিল্পায়নের আগ্রহ ভাল, আদেখ্‌লেপনা খুবই খারাপ ...

বিজনদা সারা জীবন আদেখ্‌লেপনার বিরোধিতা করেছেন, নিভৃতে কাজ করেছেন, কাজ করেছেন গরীব-গুর্বো মানুষদের প্রকৃত উন্নতির জন্য। জঙ্গলের আর তার মানুষদের আপনজন বিজন ষড়ঙ্গীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর তাঁর দেহ মেলে কলাবনীর জঙ্গলে। মৃত্যুর সময় চুয়াল্লিশ বছরও বয়স হয়নি বিজন ষড়ঙ্গীর (১৭/০৮/৬৩ - ২২/০৫/২০০৯)। এত অল্প দিনে অনেক কাজ করে গেছেন তিনি। বিজনদা নেই। আবার তিনি রয়েও গেলেন তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে, যে কাজ চিরকাল লড়াকু কর্মীদের প্রেরণা দেবে প্রকৃতি ও মানুষ বাঁচানোর লড়াইতে। ❑

লেখক পরিচিতি: ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কলকাতার নিউ আলিপুর কলেজের ইতিহাসের রিডার ও বিভাগীয় প্রধান। তাঁর গবেষণার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস। তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ'-এর সম্পাদক ও ১৯৯৫ সাল থেকে 'কালান্তর' পত্রিকার 'প্রকৃতি ও মানুষ' বিভাগের সম্পাদক। সব্যসাচী বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী, লেখক ও ইতিহাসকার। এই বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, 'সোনার বাংলা বিজ্ঞান সঞ্চার সমিতি'-র সভাপতি। বিজ্ঞানকর্মী বিজন ষড়ঙ্গীর স্মরণে প্রকাশিত 'স্মৃতিতে বিজন' (২০০৮) বই সম্পাদনা করেছেন।

ভারত সরকারের ওষুধ নীতি কি জনমুখী?

এদেশে ওষুধশিল্প বেশ বড় একটি ইন্ডাস্ট্রি। তবুও কি ভারতের সব মানুষ প্রয়োজনে সব ওষুধ পান? আমরা জানি পান না। অনেক ওষুধই তাঁদের কেনার ক্ষমতা নেই, এবং সরকারি ব্যবস্থাও তাঁদের কাছে প্রাণদায়ক ওষুধগুলিকে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে পৌঁছে দিতে পারে নি। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার হল জনকল্যাণকামী সরকার। সে সরকার কি প্রয়োজনীয় সব ওষুধকে সমস্ত মানুষের হাতের নাগালে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন? সদর্থক জনকল্যাণমুখী নীতি প্রণয়ণ করেছেন? **আলোচনা করেছেন ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত।**

আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে বস্তুটি তার নাম হল 'মেডিসিন' বা 'ড্রাগ', বাংলায় ওষুধ অথবা ভেষজ। এর প্রয়োগই মুমূর্ষু রোগীকে নিরাময় করে, মৃতপ্রায় মানুষকে আবার ফিরিয়ে আনে জীবনের বহতা স্রোতে। বলা হয়, ১৯২৯ সালে পেনিসিলিনের আবিষ্কার মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে নতুন করে লিখেছে। বহু গবেষক উল্লেখ করেছেন, যদি পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হত, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা হত দ্বিগুণ। ১৯৪৪ সালে যক্ষার প্রথম ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কার স্যানেটোরিয়াম, ফুসফুস কেটে বাদ দেওয়া-নির্ভর যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। ''মেঘে ঢাকা তারা''-র নীতাদের জীবনে আশার আলো ফেলে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই 'আশীর্বাদ' দেশের বা রাজ্যের ক'টি ঘরে পৌঁছেছে? ভারতবর্ষের ১১৫ কোটি অধিবাসী অথবা রাজ্যের ৮.৫ কোটি মানুষের ক'য় শতাংশ ওষুধ ব্যবহারের সুফল পান? এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট গবেষণা হয়নি - ফলে পুরোপুরি সঠিক তথ্যও নেই। তবে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, স্থানবিশেষে ভারতবর্ষের মাত্র ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ নিয়মিত ওষুধের ব্যবহার করতে পারেন। আরও ১০ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ অনিয়মিত ভাবে বা কখনও কখনও ওষুধ খেয়েছেন (প্রসঙ্গত, ওষুধ বলতে আমরা এই প্রবন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাসম্মত ওষুধের কথাই বলছি - হোমিওপ্যাথি, আর্য়ুবেদ, ইউনানি, জড়ি-বুটি ওষুধের কথা নয়)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের এই দানের কোনও সুফল এখনও পাননি। যে ৩০ শতাংশ মানুষ ওষুধ খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৮ শতাংশ কেবল বিনা পয়সায় (সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা অন্য কোনও উৎস থেকে) তা পেয়েছেন। বাকি ৯২ শতাংশকেই নিজেদের পয়সায় কিনে খেতে হয়েছে।

কিন্তু জাতীয় ওষুধ নীতি (National Drug Policy) নিয়ে লিখতে গিয়ে এত 'ধান ভানতে শিবের গীত' কেন? এ জন্যই যে জাতীয় ওষুধ নীতি সূত্রায়িত করা হয়েছে যে সব উদ্দেশ্যে, তার মধ্যে প্রধান হল—

১) ওষুধের সর্বজনীন ব্যবহার - যাতে অন্তত প্রয়োজনীয় এবং জীবনদায়ী ওষুধ সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে পৌঁছয়।

২) ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ - গরীব মানুষরা যাতে ওষুধ পান।

৩) ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণ - নিম্ন গুণমান-সম্পন্ন কম কার্যকারিতার ওষুধ এবং ভেজাল ওষুধ বন্ধ করা।

এই সব উদ্দেশ্যের সঙ্গে নব্বইয়ের দশকের নয়া অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে যুক্ত হয়েছে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তা হল— ওষুধের দেশীয় বাণিজ্য এবং রফতানি বাণিজ্যকে আরও বিকশিত করা। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে সংক্ষেপে জানা দরকার ওষুধ শিল্পের বিকাশের ইতিহাস।

প্রেক্ষাপট

ওষুধ জিনিসটা কি? ওষুধ হল, যে কোনও (রাসায়নিক) বস্তু, মানবদেহে যার প্রয়োগ দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার (Internal Milieu)-এর পরিবর্তন ঘটায়। ভেষজবিদ্যা (Pharmacology)-র সংজ্ঞা হিসেবে ''ওষুধ হল এক রাসায়নিক দ্রব্য যা রোগ নিরাময় করতে, রোগ প্রতিরোধ করতে অথবা রোগ নির্ণয় করতেও ব্যবহৃত হয় এবং এর ব্যবহার শারীরিক বা মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়।'' ওষুধের প্রয়োগ ঘটে শরীরের বাইরে থেকে, চিকিৎসকের নির্দেশ মোতাবেক। উদাহরণস্বরূপ - ইনসুলিন আমাদের দেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির এক রস বা হরমোন। কিন্তু সেটাই বাইরে থেকে প্রযুক্ত হলে 'ওষুধ' পদবাচ্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওষুধ এবং খাদ্যের মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট - যেমন, খনিজ লবণ, সুরাসার (Alcohol) প্রভৃতি।

চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের আবিষ্কার, উৎপাদন এবং প্রয়োগও বেড়েছে। মধ্যযুগে ওষুধ বলতে ছিল কিছু খনিজ পদার্থ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বস্তুর অশোধিত জলীয় বা সুরাসার ঘটিত দ্রবণ। তার না ছিল নির্দিষ্ট মাত্রা, না-জানা ছিল পাঁচমেশালি পদার্থের মধ্যে আসল কোন বস্তুটি কার্যকরী - সে তথ্য, সঙ্গে ছিল নানা অবৈজ্ঞানিক অনুপান। বহু ক্ষেত্রেই ওষুধ রোগ সারানোর বদলে হয়ে উঠত প্রাণঘাতী।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা প্রমাণ-নির্ভর চিকিৎসাবিজ্ঞান (Evidence Based Medicine)-এর হাত ধরে, ওষুধের প্রস্তুতিও মধ্যযুগের 'অ্যালকেমিস্ট'দের হাত ছাড়িয়ে, 'ফার্মাসিস্ট'দের আওতায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। দীর্ঘতর হতে লাগল ওষুধের তালিকা। কেবল রোগ

নিরাময় নয়, রোগ প্রতিরোধের জন্যও ওষুধ সৃষ্টি হল। ১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার প্রাণঘাতী গুটিবসন্তের টীকা আবিষ্কার করেন। পাস্তুর আবিষ্কার করেন জলাতঙ্কে রোগের প্রতিষেধক। তারপর থেকে বহু টীকা বা ভ্যাকসিন এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। এমনকি রোগ নির্ণয়ের কোনও কোনও রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন : এক্সরে-র কনট্রাস্ট ডাই) আজ ওষুধ পদবাচ্য।

প্রথমে যা ছিল চিকিৎসকের নিজের হাতে তৈরি, গাছগাছড়া রস-সঞ্জাত, তা-ই শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে পরিণত হয়েছে বিশ্বজোড়া ট্রিলিয়ান ডলারের বাণিজ্যে - যার স্থান বোধকরি অস্ত্র-ব্যবসার ঠিক পরেই। এবং বিশ্বব্যাপী মন্দাকে অগ্রাহ্য করে এই বাণিজ্যের লেখচিত্র ক্রমশই ঊর্ধগামী।

ভারতবর্ষের ওষুধশিল্প ও ওষুধনীতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ওষুধের মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকার। বর্তমানে এই বাণিজ্যের মোট পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার মতো, যার মধ্যে মূল বুনিয়াদী ওষুধ (Bulk Drug) তৈরি হয় প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকার। ভারতবর্ষ ওষুধ উৎপাদন এবং রফতানিতে পৃথিবীতে এক প্রধান দেশ - ওষুধ উৎপাদনের পরিমাণে চতুর্থ এবং মোট উৎপাদনের অর্থমূল্যে ত্রয়োদশ। বিশেষত, সবচেয়ে কম খরচে 'জেনেরিক' বা বর্গনামে ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীনের পরেই আমাদের স্থান। (একটি ওষুধ একটি বর্গনামে সর্বত্র পরিচিত হয়। কিন্তু ওই একটি ওষুধকে এক-একটি কোম্পানি বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বাজারে ছাড়ে। যেমন 'প্যারাসিটামল' এই বর্গনামের ওষুধটিকে বিভিন্ন কোম্পানি 'ক্যালপল', 'ক্রোসিন', 'পাইরিজেসিক' ইত্যাদি নানা ব্র্যান্ড নামে বাজারে ছাড়ে।) এর অন্যতম প্রধান কারণ হল, অতি সুলভ শ্রমশক্তি এবং প্রচুর ইংরেজি জানা বিজ্ঞান-প্রশিক্ষিত মানুষ।

১৯৭৫ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত হাথি কমিটি বলেন যে, মূলত ১০৪টি ওষুধ হল প্রয়োজনীয় (Essential) ওষুধ। এই ক'টি ওষুধ সমস্ত দেশবাসীর কাছে লভ্য করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ঐ কমিটি করেছিল। হাথি কমিটির রিপোর্টে ধরা পড়েছিল - ওষুধের উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, প্রচার-বিজ্ঞাপন, কেনাবেচা প্রভৃতি সব কিছুতেই নানা কারচুপি রয়েছে। বহু অপ্রয়োজনীয়, এমনকী, নিষিদ্ধ ওষুধও বাজারে ব্যাপক ভাবে বিক্রি হচ্ছে। হাথি কমিটি লাগামহীন মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাণিজ্যিক নামের বা ব্র্যান্ড নামের ব্যবহার বন্ধ করে সর্বস্তরে বর্গনাম (Generic) চালু করার সুপারিশ করে। বিদেশি কোম্পানিগুলির প্রাধান্য খর্ব করতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা, প্রয়োজনে জাতীয়করণের কথা - প্রভৃতি কমিটির প্রস্তাবে ছিল। এর কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রথম জাতীয় ওষুধ নীতি, ১৯৭৮

১৯৭৮ সালের জাতীয় ওষুধনীতিতে বহু জনমুখী ব্যবস্থার কথা বলা হয়। - যেমন, ওষুধ উৎপাদন ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন, রাষ্ট্রীয় ওষুধ কারখানার নেতৃত্বকারী ভূমিকা, স্বদেশী উদ্যোগের প্রসার, প্রয়োজনীয় ওষুধ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এনে দেওয়া প্রভৃতি। এক বছর পরে আনা ১৯৭৯ সালের 'মূল্যনিয়ন্ত্রণ আদেশ' এ বিষয়ে এক জরুরি পদক্ষেপ, যার আওতায় ৩৪৭টি ওষুধকে আনা হয়। দেশের মোট ওষুধের ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য ছিল। ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইন ও দেশীয় ওষুধ শিল্পের উত্থান এবং বিকাশের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৮ সালের জাতীয় ওষুধনীতিতে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা এই রকম -

- বড় কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে 'নির্মিত' ওষুধ (Formulations) ছাড়াও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 'বুনিয়াদি' ওষুধ (Bulk Drug) উৎপাদন বাধ্যতামূলক করা।
- কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন দেশি ও ক্ষুদ্র ওষুধ কোম্পানিগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা।
- কোম্পানিতে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ (F.D.I.) ৫০ শতাংশের কম হতে হবে।
- কোম্পানিতে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ৪০ শতাংশের কম হলে, তবেই তাকে দেশি কোম্পানির জন্য সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

এই সব নীতির ফলে দেশি শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি হয় ও ওষুধের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু পরে নব্বইয়ের দশকের পর থেকে নয়া অর্থনীতির ঝোড়ো হাওয়ায় এই সব নীতির ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন ঘটল। ১৯৮৬ সালে নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চাপে ভারত সরকার জাতীয় ওষুধ নীতিকে সংশোধন করে নূতন ওষুধের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে কিছু কড়া আচরণবিধি প্রবর্তন করলেন। অবৈজ্ঞানিক ওষুধগুলি ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ করা ও অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তদারকি ব্যবস্থার প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি অবৈজ্ঞানিক ওষুধকে নিষিদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

ওষুধ নীতি ১৯৮৬ (ভেষজ শিল্পের যুক্তিসঙ্গত, গুণমানযুক্ত বিকাশ ঘটানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ)

১৯৮৬ সালে ১৯৭৮ সালের ওষুধনীতিতে নানা সংশোধনী আনা হয়। মোটের উপর এই স্বাস্থ্যনীতি ছিল জনমুখী ও এই ওষুধনীতির মধ্যে কল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই বিবৃত ছিল, কেবল 'বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতার' নয়। গরীব মানুষ বাস্তবে অবশ্য এইসব পুঁথিগত প্রতিশ্রুতির পুরো সুফল পাননি।

- স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো রাষ্ট্রের এক প্রাথমিক কর্তব্য। স্বাধীনতার পর জনস্বাস্থ্যের নানা উন্নতিও ঘটেছে। ম্যালেরিয়া বা গুটি বসন্তের নিয়ন্ত্রণ, মৃত্যুহারের অবনয়ন, জীবনকালের বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটেছে। আরও উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ওষুধপত্র।
- ১৯৮৩ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" -এই লক্ষ্যকে সফল করতে গেলে প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় ও জীবনদায়ী ওষুধ ও টীকা। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারও জরুরি। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ভেষজশিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

✸ হাথি কমিটির (১৯৭৫) রিপোর্টে আত্মনির্ভরতা এবং সুলভে প্রচুর ওষুধ সরবরাহের উপর জের দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়ে দেখা যায় কী ভাবে ভারতীয় ভেষজ শিল্প আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে এবং বুনিয়াদী ওষুধের রফতানি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

✸ কিন্তু ওষুধের উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জীবনদায়ী ও প্রয়োজনীয় ওষুধের বিশেষ ঘাটতি আছে। অপর পক্ষে, নানা ধরনের অবৈজ্ঞানিক ওষুধ (Formulation) গুরুতর চিন্তার বিষয়। ওষুধের গুণগতমান অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ। নতুন ওষুধের নথিভুক্তি, খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য এবং ঔষধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী পাওয়া ও চিকিৎসকদের গোচরে আনার ব্যবস্থা মোটেই যথাযথ নয়।

✸ নূতন ওষুধ নীতির উদ্দেশ্য হল সুলভে, নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনীয়, জীবনদায়ী ও রোগ প্রতিরোধক ওষুধ যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

১৯৮৬ সালের ওষুধনীতি জাতীয়তাবাদী ও কিছুটা জনমুখী ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। অ্যালোপ্যাথি ছাড়া অন্য পদ্ধতির ওষুধকেও (আয়ুর্বেদ, সিদ্ধাই ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার কথাও বলা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ নিয়ন্ত্রক নিয়ামক সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, ওষুধ পরীক্ষার গবেষণাগার বাড়ানো, উৎপাদনের শংসাপত্র (Accreditation Certificate) চালু করা (যেমন : Good Manufacturing Practice) এই সবও ওই প্রস্তাবে ছিল। অতি প্রয়োজনীয় ১৫ টি ওষুধের (যেমন - স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, জেন্টামিসিন, মরফিন, ফলিক অ্যাসিড প্রভৃতি) উৎপাদন সংরক্ষিত রইল সরকারি সংস্থাগুলির জন্য। ৬৬টি বুনিয়াদী ওষুধ উৎপাদনে বিদেশি পুঁজি লগ্নি হয়েছে এমন কোম্পানিগুলিকেও (FERA) অনুমোদন দেওয়া হল। অবশ্য ১৯৮৬ সালের ওষুধনীতির মধ্যেও ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 'নমনীয়' কথা বলা হল উৎপাদন বাড়ানোর স্বার্থে, যা ১৯৭৮ সালের মূল নীতির থেকে অবশ্যই পরিবর্তিত। হাথি কমিটির সুপারিশ মতো 'ন্যায্য মূল্যের' কথা উল্লেখ করেও বলা হল যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণকে সরল করতে হবে এবং তার বিস্তৃতিও কমাতে হবে - যাতে উৎপাদকরা 'উৎসাহ পান' এবং 'নায্য মুনাফা পান'। একথাও বলা হল যে, ১৯৭৯ সালের ৩৪৭টি বুনিয়াদী ওষুধের ও চার হাজার ফর্মুলেশনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণকে ''আরও সরল ও কার্যকরী'' করতে হবে। আমরা পরে দেখব, এই সব ভালো কথা বলে কার্যত ২০৫টি বুনিয়াদী ওষুধকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালে ৯০ শতাংশ ওষুধ ছিল মূল্য-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। ১৯৮৭তে তা দাঁড়াল ৭০ শতাংশে। বাস্তবে এই পদক্ষেপ ''গরিব মানুষের কাছে সুলভে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার'' ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। এ ছাড়াও, ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রবল প্রভাবে লেখা হল প্রতিযোগিতা বাড়ানোর কথা এবং শিল্পের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বাধা দূর করার কথা। ১৯৮৭ সালেই নব্বই-এর দশকের নয়া

অর্থনীতি ও উদারীকরণের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। তার তালে তাল মিলিয়ে বলা হল অনুমতিদান প্রথা আরও সরল ও নমনীয় করার কথা, জীবনদায়ী ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাজারকে আরও ছাড় দেওয়ার কথা। অবশ্য বিদেশি বিনিয়োগ-যুক্ত কোম্পানি (FERA)গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রইল। জাতীয় স্বাস্থ্য-প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজন এমন তালিকাভুক্ত বুনিয়াদী ওষুধের ক্ষেত্রে (১ নং তালিকা) ৭৫ শতাংশ মুনাফা অনুমোদিত হল। অন্যান্য বুনিয়াদী ওষুধের ক্ষেত্রে (২ নং তালিকা) ১০০ শতাংশ মুনাফা অনুমোদিত হল। অন্যান্য (তালিকাভুক্ত নয়) ওষুধের ক্ষেত্রে মুনাফার উর্ধসীমা নেই। তা কয়েক হাজার গুণও অনায়াসেই হতে পারে।

১৯৯৪ সাল : পালাবদলের পালা

১৯৯৪ সালে ১৯৮৬-র গৃহীত নীতির নানা ংশোধন করা হয়। এই প্রস্তাবে প্রথমেই বলা হয়েছে, ১৯৮৬ সালের নীতির ফলে ভারতের ভেষজ শিল্পের বিপুল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। যেমন—

- দেশে ২৫০টি বৃহৎ ও ৮০০০ ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থা ৩৫০ ধরনের বুনিয়াদী ওষুধ ও প্রায় সমস্ত তৈরি ওষুধ উৎপাদন করে, যা দেশের ৭০ শতাংশ চাহিদা মেটায়।
- ১৯৮০-৮১ সালের তুলনায় বুনিয়াদী ও তৈরি ওষুধ উভয়েরই উৎপাদন পাঁচ-ছ গুণ বেড়েছে।
- রফতানি প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধনাত্মক বাণিজ্য-ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সব সাফল্যের প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালের সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হল -

- শিল্পের আরও বিকাশের স্বার্থে ভেষজশিল্পে লাইসেন্স প্রথার অবস্থান ঘটাতে হবে।
- সরকারি ওষুধ কোম্পানিই কেবল উৎপাদন করে, এমন সংরক্ষিত ওষুধের তালিকা তুলে দেওয়া হল।
- সমাগত গ্যাট চুক্তি ও পরিবর্তিত পেটেন্ট আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হল।
- ৪০ শতাংশের স্থানে ৫১ শতাংশ বিদেশি পুঁজি লগ্নি হয়েছে, এমন কোম্পানিগুলি দেশি কোম্পানির প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে।
- মূল্য নিয়ন্ত্রণকে আরো কমিয়ে আনা, এমনকী, সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রেও।
- মূল্যে সমতার জন্য বিভিন্ন ফর্মুলেশনের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য স্থির করা।
- এই সব নীতির ফলে যাতে ওষুধের দাম ভীষণ ভাবে বেড়ে না যায়, সে জন্য 'জাতীয় ভেষজ মূল্যমান অধিকার' নামে বিশেষজ্ঞদের একটি নিরপেক্ষ কমিটি তৈরির প্রস্তাব হল - যাঁরা প্রতি বছর মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকা ওষুধের তালিকা প্রকাশ করবেন। মূল্য-নিয়ন্ত্রণবিহীন ওষুধের মূল্যের ওপর নজর রাখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হল।
- যে সব ওষুধকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ তালিকার বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির দামের ওপর সরকার নজর রাখবে এবং প্রয়োজন বোধে আবার সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করবে।
- গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে।
- ইতিমধ্যে ৪৪ টি ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও ওষুধ (অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকারক) নিষিদ্ধ হবে। দেশের ৫টি প্রধান হাসপাতালে বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত তথ্য

সংগ্রহ, নথিবদ্ধ ও নজরদারি করার ব্যবস্থা হবে।

১৯৯৪ সালের পরিবর্তিত নীতির ফলে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকা ওষুধের সংখ্যা ১৯৮৬ সালে ১৪২টি থেকে আরও কমে দাঁড়াল ৭৬ -এ। দেশে মোট ওষুধের ৭০ শতাংশ-এর মূল্য নিয়ন্ত্রণের স্থানে, এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত ওষুধের সংখ্যা দাঁড়াল ৫০ শতাংশে।

বিরাট বিপরীত যাত্রা : ওষুধনীতি ২০০২

২০০২ সালে কেন্দ্রে NDA সরকারের সময় ওষুধনীতির আবার পরিমার্জনা করা হল। প্রকৃতপক্ষে সংশোধন না বলে এ টিকে নতুন প্রস্তাব বলাই সমীচীন, কেন না এর দ্বারা পূর্ব-ঘোষিত লক্ষ্য ও প্রয়োগকে পুরোপুরি পালটে ফেলা হল।

২০০২ সালে নতুন প্রস্তাবের মুখবন্ধে অবশ্য বলা হয়েছিল, ১৯৮৬ সালের ভেষজনীতির মূল ধারণা এখনও বজায় রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের জন্য ভেষজ শিল্প নানা নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্বায়িত অর্থনীতি এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র চুক্তির বাধ্যবাধকতায় ওষুধনীতিতে পরিবর্তন জরুরি। ভেষজশিল্পের মতো এক প্রধান জ্ঞান-নির্ভর শিল্পে তাই নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে, যাতে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হয়ে থাকতে পারে।

স্পষ্টতই, দেশের দরিদ্র জনগণকে স্বল্পমূল্যে জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের প্রতিশ্রুতির স্থানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে জাতীয় অগ্রাধিকার।

'জাতীয় ঔষধনীতি ২০০২' -এর নথিতে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৯১ সালে চালু হওয়া উদারনীতি ওষুধশিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথাকে এবং আমদানির ক্ষেত্রে নানা বাধাকে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। তাই নতুন সুপারিশগুলি হল -

- যেসব বুনিয়াদী ওষুধ উৎপাদনে বংশাণু (DNA), নিউক্লিক অ্যাসিড বা কোনও কোষ ও কলা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বাদে আর সমস্ত ওষুধের উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা বাতিল করা হল।
- ১৯৯৯ সালের মার্চেই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধসীমা বাড়িয়ে ৫২ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশ করা হয়। এখন তা ১০০ শতাংশ করা হল।
- উৎপাদনে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হল (বংশাণু পরিবর্তিত প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া)।
- সরকারি ভেষজ সংস্থাগুলির সব রক্ষাকবচ সরিয়ে নিয়ে তাদের নির্দেশ দেওয়া হল বাজারের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে। যেখানে সম্ভব সেখানে এই ধরনের সংস্থার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত করতে বলা হল।
- রফতানি উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ওষুধের সমস্ত কাঁচামাল বিনা শুল্কে আমদানি করা হবে।
- নূতন পেটেন্ট বিল সংসদে আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়। এই আইনের ফলে পেটেন্টের সময়সীমা ৫ বছর থেকে বেড়ে ২০ বছর দাঁড়াবে।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে গ্যাট চুক্তি এবং মেধাসত্ব আইনের (TRIP) হাত ধরে যে নতুন

পেটেন্ট আইন ভারতবর্ষে ২০০৫ সালে লাগু হয়, তার অভিঘাত এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে সমস্ত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পড়েছে, তার মধ্যে অগ্রগণ্য ভেষজশিল্প। উৎপাদন পদ্ধতির স্থানে উৎপাদিত বস্তুর পেটেন্ট, ২০ বছরের জন্য পেটেন্ট - এই সব কারণে ৭০-এর দশক থেকে দেশীয় ওষুধশিল্পে যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল, তা অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বহুজাতিক ও অধিজাতিক দেশীয় বাজার দখল করেছে। বিরাট সাফল্য পাওয়া ক্ষুদ্র ওষুধশিল্পের অন্তর্জলি যাত্রা ঘটতে চলেছে। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে আকাশছোঁওয়া।

নতুন পেটেন্ট আইনের বাধ্যবাধকতার কথা ২০০২ সালের ভেষজনীতিতে স্পষ্টতই স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই এই ভেষজনীতিতে আমূল পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে -যা, আমাদের মতে, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আবার বলা হল যে, পূর্বতন নীতিতে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। কী সমস্যা, তার কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু তার সমাধান দেওয়া আছে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণকে আরও 'নমনীয়' করা। আরও বেশি বেশি বুনিয়াদী ওষুধ ও তৈরি ওষুধকে ঐ তালিকা থেকে বার করে আনা। নানা ধানাই-পানাই করে, নানা জনমুখী ভালো ভালো কথা বলে, মোদ্দা যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল, তা আমরা ১৯৮৭-র পর থেকেই বার বার শুনে আসছি। তা হল-

- বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে ও দ্রব্যের ওপর পেটেন্ট নেওয়ার যে আইন আসছে, তার ফলে উদ্ভূত সুযোগকে কাজে লাগাতে আমাদের দেশের ওষুধশিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে।
- ওষুধের ওপর মূল্যনিয়ন্ত্রণের বিস্তৃতি অনেক কমানো হবে। কিন্তু সমাজের দুর্বলতর অংশের কথা মাথায় রেখে, মূল্য অতিরিক্ত বেড়ে গেলে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকার নিজের হাত রাখছে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! শুধু ফলাফল দেখুন -

	১৯৭৯	১৯৮৭	১৯৯৫	২০০৩
মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত ওষুধ	৩৪৭	১৪২	৭৬	৭৪
দেশে উৎপাদিত মোট ওষুধের কত শতাংশ	৯০%	৭০%	৫০%	৩৬%(?)

লাইসেন্স রদ করা, বিদেশি পুঁজির অনুমোদন, মূল্য-নিয়ন্ত্রণের অবলুপ্তি ঘটানো, এ সব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হল। কিন্তু, আগেকার স্বাস্থ্যনীতিতে যেমন বলা হয়েছিল, অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকারক ঔষধ বাতিল, বা ব্র্যান্ড নামের পরিবর্তে 'বর্গ' (জেনেরিক) নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা ও বাণিজ্যিক নাম নিষিদ্ধ করা, এ সব কিছুই করা হল না। নিম্নমানের ঔষধ ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করা বা বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত নজরদারি সারা দেশে চালু করাও হল না। এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ঔষধ, অন্য বহু দেশে নিষিদ্ধ এবং ক্ষতিকারক ঔষধ, ঔষধ পদবাচ্যই নয় এমন বহু জিনিস অবাধে বাজারে চলছে। মানুষ কিনছেন, খাচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বিপুল ভাবে।

উপসংহার

"সুলভে সব ধরনের ওষুধ সমস্ত মানুষের কাছে লভ্য করা" হচ্ছে বার বার ঘোষিত নীতি - অথচ কার্যক্ষেত্রে এমন ভাবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হচ্ছে যে, তা হয়ে উঠেছে আরও মহার্ঘ এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। লাইসেন্স প্রথা বাতিল করা হচ্ছে এই যুক্তিতে যে, বাজারি প্রতিযোগিতা ওষুধের দাম কমাবে। অথচ, কার্যত বাণিজ্যিক নামে ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ না করার ফলে এবং ইচ্ছামত অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ বিক্রিকে ঢালাও অনুমতি দেওয়ায় ওষুধের দাম হু হু করে বেড়েই যাচ্ছে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বসীমাও উৎপাদকরা মানছেন না। সরকারও উদাসীন।

জীবনদায়ী ওষুধের সর্বোচ্চ অনুমোদিত মুনাফা ৪০ শতাংশ, অত্যাবশক ওষুধের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ, প্রান্তিক প্রয়োজনীয় ওষুধের মুনাফা ১০০ শতাংশ ও অন্যান্য ওষুধের মুনাফা করা হল লাগামহীন। এর ফল দাঁড়াল কোম্পানিগুলি দ্বারা জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধের উৎপাদনে ঘাটতি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বেশি উৎপাদন করে বিপুল লাভ।

১৯৮৬ সালে জীবনদায়ী ওষুধে ৭৫ শতাংশ ও

হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ঔষধ, অন্য বহু দেশে নিষিদ্ধ এবং ক্ষতিকারক ঔষধ, ঔষধ পদবাচ্যই নয় এমন বহু জিনিস অবাধে বাজারে চলছে। মানুষ কিনছেন, খাচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বিপুল ভাবে।

অত্যাবশ্যক ওষুধে ১০০ শতাংশ মুনাফা অনুমোদন করা হল। অন্য সব ওষুধের ক্ষেত্রে মুনাফা লাগামহীন। এর সঙ্গে বহু ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসা হল। তাতেও কোম্পানিগুলির মুনাফা বাড়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হল না।

২০০২ সালের নীতির ফলে ঔষধের দাম বেড়েছে রকেটের গতিতে। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষজনের কথা তো কোন ছাড়, মধ্যবিত্তদের পক্ষেই ওষুধ ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। মুখে প্রান্তিক মানুষজনের কথা বলে কার্যত কেবল বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং মুনাফার নীতিতে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

লক্ষণীয় বিষয় যে, বারে বারে ভেষজ শিল্পের 'সাফল্য' তুলে ধরতে গিয়ে পরিখ্যান দেওয়া হয় কত কোটি টাকার উৎপাদন বা বাণিজ্য বাড়ল, তার। দেশের কত শতাংশ মানুষ এই নীতির ফলে উপকৃত হয়ে ওষুধ পেলেন, মাথাপিছু ওষুধের ব্যবহার কেমন বাড়ল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। ২০০২ সালের নথিতে পরিষ্কার স্বীকার করা হয়েছে যে, কত বুনিয়াদী বা তৈরি ওষুধ দেশে বিক্রি হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। কিছু বেসরকারি তথ্যের উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - যেমন, ORG-MARG, CIMS, MIMS ইত্যাদি। কিন্তু, এ সবই যে অতি অপরিমিত ও অনির্ভরযোগ্য তথ্য-ভান্ডার, তা-ও স্বীকার করা হয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের (২০০৫-২০১২) নথিতেই বলা হয়েছে যে, ৪০ শতাংশ ভারতবাসী হাসপাতালের খরচের জন্য ঋণগ্রস্ত এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের ৫৮ শতাংশ (গড়ে) চিকিৎসার খরচে ব্যয় হয়। কেবল হাসপাতালের খরচ মেটাতে গিয়ে ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে তলিয়ে যান। সেখানে কী ভাবে সরকার জনস্বার্থের কথা বলে, কেবল বাণিজ্যের স্বার্থে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণকে লাগাতার ভাবে লঘু করে, বিপুল মূল্যবৃদ্ধিতে এবং কোম্পানিগুলির মুনাফাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তা বোঝা সত্যিই কঠিন।

১ জানুয়ারি ২০০৫ সালে লাগু হওয়া নতুন মেধাস্বত্ব ও পেটেন্ট আইন, গত চার-পাঁচ দশক ধরে বিকশিত দেশীয় ওষুধ শিল্পের (বিশেষত ছোট উৎপাদকদের) মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ পেটেন্ট আজ বহুজাতিকদের হস্তগত। ছোট কোম্পানিগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে।

৪০ শতাংশ ভারতবাসী হাসপাতালের খরচের জন্য ঋণগ্রস্ত এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের ৫৮ শতাংশ (গড়ে) চিকিৎসার খরচে ব্যয় হয়। কেবল হাসপাতালের খরচ মেটাতে গিয়ে ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে তলিয়ে যান।

বহু ক্ষুদ্র উৎপাদক ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। র‍্যানব্যাক্সি বা পিরামলের মতো কোম্পানি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিদেশি অধিজাতিকদের কাছে। ঔষধের আমদানি বাড়ছে। বাড়ছে পেটেন্ট দখল করে, দেশে উৎপাদন না-করে, উচ্চমূল্যে বুনিয়াদী ওষুধ আমদানি করার প্রবণতাও। দেশীয় বাজারে প্রায় ৮০ শতাংশ দখল করেছে দানবাকৃতি বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন কমে যাচ্ছে, নতুন নতুন বাণিজ্যিক ফর্মুলেশনে ভরে যাচ্ছে বাজার।

সরকারের ওষুধনীতি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। বার বার মুখে জনস্বার্থের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে, পুঁজি ও বাণিজ্যের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বৈধ-অবৈধ মুনাফা ফুলে, ফেঁপে উঠেছে আর সুলভ জীবনদায়ী ওষুধের অভাবে পোকামাকড়ের মতো মারা পড়ছেন সাধারণ ভারতবাসী। ❑

লেখক পরিচিতি : ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এম বি বি এস, ডি সি পি, এম ডি, পেশায় বিশেষজ্ঞ বায়োকেমিস্ট-প্যাথোলজিস্ট। এছাড়া তিনি বাংলা ভাষায়একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

ডা. বিনায়ক সেনের ভাষণ

ক্ষুধা, উৎখাত : সুবিচারের সন্ধান

সমাজে অসাম্য ও বঞ্চনা জন্ম দেয় দারিদ্র আর ক্ষুধার। ক্ষুধা, খাদ্যের দীর্ঘকালীন অভাব মানুষকে শারীরিক ভাবে অপুষ্ট করে। অপুষ্টি শুধু মানুষকে অবমানুষের মত বেঁচে থাকতে বাধ্য করে, তাই নয়, অপুষ্টি নানা রোগের কারণ। অথচ এই অপুষ্টি এবং তার কারণ যে সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্য সেগুলিকে ভারতবর্ষের সরকার বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁরা উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করছেন। বড় শিল্পগোষ্ঠিকে তুষ্ট করতে জনগোষ্ঠির জীবন বিপন্ন করছেন। অন্যদিকে সেই সরকারই যক্ষ্মারোগ, যার মূল প্রোথিত দারিদ্র আর অপুষ্টির গভীরে, সে রোগ নির্মূল করার দেশজোড়া এক অভিযান চালাচ্ছেন। এ ধরনের স্বাস্থ্য-প্রকল্পে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী - **বলছেন ডা. বিনায়ক সেন।**

আঠারোশো ছিয়াত্তর। 'কাইসার-এ-হিন্দ' অর্থাৎ ভারত সম্রাজ্ঞীর পদে আসীন হলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া। এই উপলক্ষে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড লিটন সপ্তাহব্যাপি যে বিপুল ভোজের আয়োজন করেছিলেন সারা দেশের তাবড় রাজা মহারাজারা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মানব ইতিহাসের এলাহিতম ভোজ বলে এই ভোজ উৎসবকে ঐতিহাসিকরা বিবৃত করেছেন। এবং আঠারোশো ছিয়াত্তর। এল নিনোর প্রকোপে দেশে টানা তিন বছর ধরে খরা চলছে। খাদ্যপণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে, সুযোগ বুঝে ফাটকাবাজ আর কালোবাজারীরা মুনাফা লুঠতে ব্যস্ত। এর দু দশক আগেই দেশে রেল ও টেলিগ্রাফ চালু হওয়ায় পণ্য-পরিবহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ খুব সহজ ও দ্রুত হয়ে গেছে। অনায়াসেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যপণ্যের দামের হের-ফেরের খবর জানা যাচ্ছে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বসেই। চেন্নাইয়ের তৎকালীন গভর্নর বাকিংহাম (যাঁর নামে চেন্নাই-এর একটি খালের নামকরণ হয়) চেষ্টা করেছিলেন জোর করে মজুতদারদের স্থানীয় বাজারে তাদের মজুত করা শস্য বিক্রি করাতে। রেভারেন্ড থমাস ম্যালথাসের যোগ্য শিষ্য লিটন বাকিংহামের এই প্রয়াসকে নিরস্ত করেন। যে সপ্তাহ জুড়ে সেই ঐতিহাসিক মহাভোজ সংগঠিত হচ্ছিল সেই সপ্তাহভোর চেন্নাই-এর পথে ঘাটে প্রায় এক লাখ মানুষ অনাহারে মারা যান। ভেল্লোর নিবাসী ডা. ইদা স্কাভার তখন ছয় বছরের বালিকা। পরবর্তী কালে তাঁর বিবরণে তিনি জানিয়েছেন যে, কয়েকজন অনাহারে ধুঁকতে থাকা শিশুকে তিনি পাঁউরুটি খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা এতটাই দূর্বল হয়ে পরেছিল যে, সেই পাঁউরুটি তাদের গলা দিয়ে নামেনি।

ফিরে আসা যাক সমকালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছয় বছরে পৃথিবী জুড়ে যতজন প্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যু ঘটেছে, এই দশকে তার থেকেও বেশি সংখ্যক শিশু সারা বিশ্বে অনাহারে, অপুষ্টিতে ও সহজে নিরাময়যোগ্য রোগে মারা গেছে। বিশ্বে প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি শিশু এরকম ভাবেই মারা যায়, আর প্রতি তিন সেকেন্ডে বিশ্বের সমস্ত দেশ সামরিক খাতে ব্যয় করে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ডলার। গোটা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা বৈষম্য আর বঞ্চনার প্রতিবাদ করছেন, সমানাধিকারের দাবী জানাচ্ছেন সেই নিরস্ত্র মানুষদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের জন্যেই এই

বিপুল খরচ।

বৈষম্য বুঝতে কোনও সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। তবুও যদি আমাদের অবস্থান এক বৈষম্য বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-ঋদ্ধ না হয় তাহলে এই বৈষম্যের স্পষ্ট রূপ ও তার গাঁটছড়াগুলো আমাদের সামনে তেমনভাবে প্রকট হবে না। যদিও সমান ভাবে এটাও সত্যি যে, বৈষম্য যে একটি আবিশ্ব রাজনৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা দেখা এবং বোঝার আগ্রহ যদি সত্যি কারো থেকে থাকে তাহলে সেটা দেখতে পাবেন না এমন দৃষ্টিহীন মানুষের সম্ভবত অস্তিত্ব নেই। একজন তরুণ সাংবাদিকের মনে রাখা জরুরী যে, বৈষম্য কখনো একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়। বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে দীর্ঘকালীন সযত্ন আন্তর্জাতিক প্রয়াসের প্রয়োজন। এমন কী সামরিক শক্তির প্রয়োগও প্রয়োজনীয়। আমার স্বভূমি ছত্তিশগড় আজ তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

ক্ষুধা

ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমার ভিরশো-র অনুশাসনের কথা মনে পড়ে। ভিরশো-র কাছে রাজনীতি হল চিকিৎসা বিদ্যাকে বুঝে নেওয়ার এক সুস্পষ্ট পদ্ধতি। এই রাজনীতিকে অবশ্যই রোগীদের শরীর-বিছিন্ন ভাবেই দেখতে হবে। (রুডলফ. এন. কে. ভিরশো জার্মানির রোগবিদ্যাবিদ)। আজকের এই বক্তব্যের প্রয়োজনে আমি বৈষম্যকে ক্ষুধা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছি।

ভারতের জাতীয় নিউট্রিশন মনিটরিং ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৩৩ শতাংশ দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছেন। তাঁদের বডি মাস ইনডেক্স (বি এম আই) ১৮.৫ (স্বাভাবিকের নিম্নতম মান)-এর কম। বিশদে দেখতে হলে দেখা যাচ্ছে যে, তপশিলি জাতির ৬০ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতির ৫০ শতাংশের বি এম আই ১৮.৫ এর নীচে। উড়িষ্যায় ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা স্বাভাবিক বি. এম. আই- এর নীচে। এমনকি মহারাষ্ট্রের মত তথাকথিত উন্নত রাজ্যের জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ মানুষ এই দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির স্বীকার। 'রূপান্তর' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে আদিবাসী গ্রামগুলোতে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই গ্রামগুলির ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ স্বাভাবিক বি এম আই-এর নীচে জীবন ধারণ করছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পরিলক্ষিত এই অপুষ্টির পরিসংখ্যান শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির পরিসংখ্যানে এক সংযোজন মাত্র। ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪৩ শতাংশের বয়স ও ওজনের অনুপাত অপুষ্টির জ্বলন্ত নিদর্শন। মুম্বই-এর পেডনেকর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে কম ওজন নিয়ে আছেন এরকম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুহার অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী কোনো জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশের বি এম আই যদি ১৮.৫-এর কম হয় তবে সেই জনগোষ্ঠীকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। এই মানক অনুযায়ী ভারতের বহু অঞ্চলের তপশীলি জাতি ও উপজাতি, উড়িষ্যার জনসাধারণকে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ কবলিত বলে উল্লেখ করা যায়।

আপনাদের জন্যে আরো সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের

অর্থনীতির অধ্যাপক উৎসা পট্টনায়েক আমাদের দেখিয়েছেন ১৯৯১ সালের পর থেকে বিশ্বায়নের সূত্রপাতে পরিবার পিছু খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হার কমেছে। ১৯৯১-এ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার বছরে যেখানে ৮৮০ কেজি মত খাদ্যশস্য ব্যবহার করতেন, ২০০৫ সালে দেখা যাচ্ছে তা কমে ৭৭০ কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্রসীমার অনেক নীচে থাকা মানুষের খাদ্যাভাব আরো প্রকট। সাধারণ ভাবে বলা যায় আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ তো

ভারতবর্ষের 'উন্নয়ন প্রকল্প'গুলির ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে তথাকথিত জনস্বার্থের নামে এই 'একচ্ছত্র আধিপত্য' প্রয়োগ দেশের কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা দরিদ্রতম বহু মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে।

আছেই, ক্রমশ তার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক কথায় বলতে গেলে ছত্তিশগড়ের আদিবাসীরা মন্বন্তরের হাতে হাত রেখেই জীবন ধারণ করে থাকেন। বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক সাধারণ সম্পত্তি থেকে উৎখাতের জন্য যে বিশদ নীতি সরকার নিয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীই তার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে সামরিকীকরণ-এর মাধ্যমেও এই উৎখাত করা হচ্ছে এবং এই সামরিকীকরণের পিছনে আছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ও বৃহৎ ব্যক্তিপুঁজির যৌথ সিদ্ধান্ত। মধ্যভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী চিরকালই চরম দারিদ্রের শিকার কিন্তু এতদিন জল, জঙ্গল ও মাটির উপর তাদের স্বাভাবিক ও সাধারণ অধিকার থাকার ফলে তাঁরা কায়ক্লেশে বেঁচে ছিলেন। আজ এই অধিকার এক হুমকির সামনে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি তাঁদের জল, জঙ্গল ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি, যা পুঁজির বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের সাম্প্রতিক ফলশ্রুতি।

দেশের সমস্ত জমি ও জমির নীচের খনিজ সম্পদের একচ্ছত্র অধিকার রাষ্ট্রের। এই তত্ত্ব 'এমিনেন্ট ডোমেইন' -এর তত্ত্ব নামে খ্যাত। সোজা কথায় এই একচ্ছত্র আধিপত্যের তত্ত্বের আড়ালে ভারত সরকার তার সহযোগী আন্তর্জাতিক পুঁজির হাতে বিপুল পরিমাণে দেশের জল, জঙ্গল ও জমি তুলে দেওয়ার কাজে রত। ভারতবর্ষের 'উন্নয়ন প্রকল্প'গুলির ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে তথাকথিত জনস্বার্থের নামে এই 'একচ্ছত্র আধিপত্য' প্রয়োগ দেশের কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা দরিদ্রতম বহু মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই 'এমিনেন্ট ডোমেইন' তত্ত্বটি সংবিধান সভায় প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং চূড়ান্ত খসড়ায় এর স্থান হয়নি।

ছত্তিশগড় ও বস্তার অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সেই অঞ্চলের মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দান্তেওয়াড়া, কাঙ্কের, রাজনন্দগাঁও, বস্তার এবং দুর্গ জেলাগুলিতে দেশের মোট আকরিক লোহার এক-পঞ্চমাংশ মজুত, যার পরিমাণ ২৩৩৬ মিলিয়ন টন এবং গড় বিশুদ্ধতার হার ৬৮ শতাংশ। বস্তার অঞ্চলে শুধু আকরিক লোহা নয়, আছে আরও বহু খনিজ সম্পদ যার সবকিছুর এখনও খোঁজই মেলেনি। আছে চুনাপাথর, বক্সাইট, হীরে এমনকি ইউরেনিয়াম। অজিত যোগী যখন সদ্য-গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন এই নতুন রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে সবচেয়ে ধনী, আর এখানকার মানুষ সবচেয়ে দরিদ্র। আবহমান কাল ধরে এই প্রাকৃতিক সম্পদ লুকানো ছিল গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে। প্রাচীনকালে এই

অরণ্য ছিল দুর্গম, আর তাই এই সম্পদ সহজলভ্য ছিল না। আর সহজ সরল আদিবাসীরা এই জমির ওপর তাদের অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল। উপনিবেশবাদের বর্তমান অবতার বিশ্বায়নের অধীনে শিল্প ও অর্থনীতির ক্রমোন্নয়ন দরিদ্র আদিবাসীদের সম্পদের ওপর চিরন্তন অধিকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

একবার যখন ছত্তিশগড়ের জঙ্গল আর খনিতে লুকিয়ে থাকা সম্পদের সম্ভাবনা সবার নজরে এল, সরকারের কাছে এই সম্পদের ওপর নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরী হয়ে পড়ল। অথচ এর আগে পর্যন্ত সরকারের এই সম্পদের মালিকানা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আর আজ যাতে টাটা, এসার, লার্ফাজ, হলসিম প্রভৃতি আন্তর্জাতিক লগ্নীকারী সংস্থা ও শিল্পগোষ্ঠী এই অঞ্চলকে দেউলিয়া করে দিতে পারে, সরকার তার জামিনদার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধুমাত্র এই লুঠকে একটা আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে, সাধারণ আদিবাসী মানুষের হাত থেকে অরণ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মিথ্যা গ্রামসভা বসানো হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের হস্তান্তর যে সরকারের পক্ষে খুব সুখকর হবে না, তা খুব শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ বস্তারের বিভিন্ন অঞ্চলে টাটা এবং এসার কোম্পানি যে জমি দখল করছে, তার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। ভ্যান্সি এলাকায় বন্দুকের মুখে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু লোহান্ডিগুদায় বিভিন্ন গ্রামসভা টাটার ইস্পাত কারখানার জন্য জমি দেওয়ার কাগজে এখনও সই করেনি। সরকার জায়গায় জায়গায় জোর করে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করছে। তবুও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব হয়নি।

বস্তার অঞ্চলে গণ আন্দোলনের ইতিহাস বহু পুরানো। এখানকার মানুষ সম্পত্তির অধিকার বলতে যা বোঝে, এবং যে ভাবে সেই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে, তা দেশের শাসন ব্যবস্থার মূলধারা থেকে আলাদা। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, রাষ্ট্রক্ষমতার অভিব্যক্তির মাধ্যম যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকরা, তাঁরা সবসময়েই ঔপনিবেশিক মানসিকতার ধারক। এর ফলশ্রুতি - প্রশাসনিক ব্যর্থতা, উন্নয়নে ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং জমি অধিগ্রহণে অহেতুক তাড়াহুড়ো। সরকার বস্তার অঞ্চলকে মাওবাদী উপদ্রব থেকে মুক্ত করার মিশন নেওয়ার অনেক আগেই, ডি.পি. মিশ্র মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, বস্তারের মুকুটহীন সম্রাট প্রবীর চন্দ্র ভঞ্জদেও খুন হন। কেননা, মধ্যপ্রদেশের রাজধানী থেকে তাঁর ডানা ছাঁটার যে নির্দেশ আসছিল, তিনি তা অগ্রাহ্য করেন।

সালোয়া জুডুমকে ছত্রিশগড়ের সরকার এবং তার ধামাধরা সংবাদমাধ্যমের ঢক্কানিনাদ নকশালী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া বলে প্রচার করছে। সুতরাং উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এমিনেন্ট

১৯৯১-এ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার বছরে যেখানে ৮৮০ কেজি মত খাদ্যশস্য ব্যবহার করতেন, ২০০৫ সালে দেখা যাচ্ছে তা কমে ৭৭০ কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডোমেইন-এর ধারণাকে কার্যকর করার বিরুদ্ধে বস্তারে গণআন্দোলনের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস বস্তার মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাস

থেকে অনেক পুরোনো এবং বহুল বিস্তৃত। যদিও কোনও সন্দেহ নেই যে সি পি আই (মাওবাদী) এই এলাকার এক প্রধান রাজনৈতিক দল। যেমন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সি পি আই) -র এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে এই এলাকায় কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী, নারী ও ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার এবং একই সাথে নির্বাচনী ও সংসদীয় প্রক্রিয়ায় যোগদান করার। ছত্তিশগড়ে যে কেউ-ই সরকারের বর্তমান কাজকর্মের সমালোচনা করেছে: যেমন বনবাসী চেতনা আশ্রমের গান্ধীবাদী সমাজসেবী হিমাংশু কুমার; নাগরিক অধিকার রক্ষা সংস্থা পি ইউ সি এল; বা জনস্বার্থ মামলায় অংশ নেওয়া বুদ্ধিজীবি - সকলের গায়েই মাওবাদী তক্‌মা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নীতির বিরোধিতা করছেন সে সমস্ত সংস্থা বা ব্যক্তি, তাঁরা সকলেই সশস্ত্র উপায়ে সরকারের গদি ওল্টানোর নীতিতে বিশ্বাসী নন। কিন্তু যেভাবে ছত্তিশগড়ে সুপরিকল্পিত উৎখাত চলছে, সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই মেরুকরণ ঘটে চলছে, যার আশু সমাধান সহজ নয়।

সমালোচকরা সযত্নে বেছে নেওয়া এক ভিন্ন অবস্থান থেকে এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নেমে আসা ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ করে চলেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা, যেমন এনকাউন্টারে মৃত্যু, অপহরণ, ধর্ষণ, রাহাজানি, এবং পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন - এই সবকিছুর রিপোর্ট সযত্নে তৈরি করছেন। অনাহারে মৃত্যু, আন্ত্রিক মহামারী, পানীয় জলের অভাব, অন্যান্য মৌলিক চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁরা রিপোর্ট তৈরি করছেন। অথচ সরকার মাওবাদী এবং মাওবাদী নয় - এমন সকলের সম্বন্ধে এক অভিন্ন অবস্থান নিয়ে বসে আছে।

অপারেশন গ্রীন হান্ট শুরু হওয়ার পর থেকে বস্তার অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানকার মানুষ উৎখাত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন। নারীরা নৃশংস ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। সামরিক অভিযানের হিংস্রতায় এলাকায় স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রশান্ত ভূষণ কিছুদিন আগে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে - ''যে সমস্ত মানুষ এই তথাকথিত উন্নয়নের দৌড়ে ভিটেছাড়া হচ্ছেন, কোনও একটা সময়ে তাঁদের এই নির্মম সত্যটা মেনে নিতে হবে যে, কোনও গণতান্ত্রিক অহিংস উপায়ে তাঁদের জমি ও জীবিকার লুঠ বন্ধ করা সম্ভব নয়। এটা একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এমনকি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাথে যে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও আর কোনও প্রশাসনিক বা আইনী ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে পারছেন না। এখন শুধুমাত্র এককাট্টা হয়ে গায়ের জোরে এই লুঠ বন্ধ করতে হবে। এই কারণেই আজ কলিঙ্গনগরে, নন্দীগ্রামে 'লড় অথবা মর' এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই লুণ্ঠন বন্ধ করার প্রয়াসে এই সমস্ত আন্দোলন আজ দিকচিহ্ন। কলিঙ্গনগর, নন্দীগ্রামের মানুষ শপথ নিয়েছেন - যাই ঘটুক না কেন, তাঁরা কোনও সরকারি আধিকারিককে তাঁদের মাটিতে পা রাখতে দেবেন না। এই অবস্থায় সরকার যদি জোর খাটায়, হিংসা অবশ্যম্ভাবী।''

এই সভায় আমি গণহত্যার প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলতে চাই। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন একসাথে বহু মানুষকে সরাসরি হত্যা করার নাম গণহত্যা। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮-এ 'গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কনভেনশনে' গৃহীত ঘোষণাপত্র, যা 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার' বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হবার ঠিক একদিন আগে গৃহীত হয়, তাতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে হত্যা ছাড়াও ''যদি কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি আচরণে এমন কোনও অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে সেই জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে, যা সেই জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিতে ফেলবে'' - এমন অবস্থাও গণহত্যার আওতায় পড়বে। মধ্য ভারতে প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে যা ঘটে চলেছে তা গণহত্যারই সমার্থক। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এই দেশের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই এই দেওয়াল লিখন পাঠে অপারগ।

তথ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণে অপারগতা : স্বাস্থ্য নীতি থেকে উদাহরণ

সাম্প্রতিক কালে যে কোনও পেশার পেশাদারদের মধ্যে সহজ ও অনায়াস সূত্র সন্ধানের এক প্রবণতা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। তথ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ এক জটিল শ্রমসাধ্য ও বৌদ্ধিক কাজ। বেশিরভাগ পেশাদাররাই এই কাজ করতে অপারগ। এই প্রেক্ষিতে এখানে যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণে যে জাতীয় নীতি আছে তা কিছু উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করতে চাই।

এই দেশে মোট জনসংখ্যার তেত্রিশ শতাংশ মানুষের বি এম আই ১৮.৫-এর নীচে। শুধু তাই নয় সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ এবং যক্ষ্মা রোগীর তিন ভাগের এক ভাগের ভার বহন করে ভারতবর্ষ। এরকম একটা অবস্থায় অপুষ্টি এবং যক্ষ্মারোগের মধ্যে যে দ্বিমুখী সম্পর্ক আছে তাই যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত নিবিড় পর্যালোচনার বিষয় হবে সেটাই ভীষণ স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই সম্পর্কে কোনও আলোচনাই এ দেশে সরকারিভাবে হয়নি। এদেশ যক্ষ্মারোগ-জনিত অসুস্থতা, মৃত্যু ও যক্ষ্মারোগের ওষুধ-প্রতিরোধজনিত (Drug resistance) ঘটনার এক বিশাল ভার বহন করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রায় ৮.৫ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মাজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত। বছরে প্রায় ৮৭ হাজার যক্ষ্মারোগীর শরীরে যক্ষ্মার অধিকাংশ ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ (Multi drug resistance) তৈরি হচ্ছে। প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের প্রাণ এই যক্ষ্মারোগ হরণ করছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পদ্ধতি (যা যক্ষ্মারোগ ও বি এম আই-এর মধ্যে এক স্থায়ী সরল রৈখিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে) ভারতবর্ষের একটিও যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধীয় সমীক্ষাতে গৃহীত হয়নি। একইভাবে সক্রিয় যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসায় পুষ্টিভরণ (Nutritional Suppliment) নিয়ে কোচরেনের সুসংবদ্ধ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Cochrane Systematic Review) অবলম্বন করে ব্যক্তিবিশেষ নিরপেক্ষ যে পরীক্ষাপদ্ধতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বসম্মত তাও আজ অবধি কোনও ভারতীয় সমীক্ষায় স্থান পায়নি। আমি এখানে দুটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করব।

জনস্বাস্থ্য সহযোগ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যা মধ্য-ভারতের ৫৩ টি জন বসতিতে স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী চালায়। এই সংগঠনে

কর্মরত আমার সহকর্মীরা ৯৭৫ জন ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে আক্রান্তদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষার ফলাফল এখনো পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মধ্য-ভারতে ফুসফুসে যক্ষ্মার ক্ষেত্রে অনাহারজনিত অপুষ্টি একটি সর্বজনীন ঘটনা। এই অপুষ্টি ফুসফুসের যক্ষ্মারোগের সঙ্গে সরাসরি ভাবে সম্পর্কিত। সমীক্ষার আওতায় আসা রোগীদের ৫ শতাংশেরও কম রোগীর ওজন স্বাভাবিক। মহিলা এবং তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও খারাপ। এমনকি এক্ষেত্রে

শুধু অপুষ্টিই কারো জীবন হরণ করার যথেষ্ট কারণ হতে পারে। দীর্ঘকালীন অপুষ্টির ফলশ্রুতি রূপে শারীরিক উচ্চতা-বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনাও এই সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত এই রিপোর্টের শেষটা এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে-

এই রিপোর্ট অপুষ্টি ও যক্ষ্মারোগজনিত মহামারীর এক নগ্ন প্রতিচ্ছবি। একদিকে রোগের ব্যাপকতা অন্যদিকে খাদ্যের অপচয়কে এই সমীক্ষা সূচিত করেছে যার যে কোনও একটিই মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত দরিদ্রদের স্বাস্থ্যকর পথ্যের প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং মানবিক পরিসরে এক অত্যন্ত জরুরী অনুজ্ঞা রূপে দেখা যাচ্ছে।

এই 'জরুরী অনুজ্ঞা'কেই অস্বীকার করে ১৯৬২-তে জাতীয় যক্ষ্মা-সংক্রান্ত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। সেই প্রাচীন কাঠামো বর্তমান সময়ের প্রকল্পেও আছে এবং তা অনুযায়ীই কাজ চলছে। উপরোল্লিখিত সমস্যাগুলো যেন সাম্প্রতিক সংযোজন মাত্র।

কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই অনুজ্ঞাকে অস্বীকার করা হ'ল? এখান থেকেই আমরা প্রবেশ করব আমার উল্লেখ করা দ্বিতীয় সমীক্ষার কথায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৬১-তে প্রকাশিত একটি বুলেটিনে এই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সক্রিয় যক্ষ্মারোগীদের ওপর পুষ্টি ভরণ (Nutritional Suppliment)-এর প্রভাব সম্পর্কিত কোচরেন -এর যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তা এই সমীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হল এই বলে - ''যে গোষ্ঠীগুলোকে পুষ্টির যোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই গোষ্ঠীগুলোকে গোষ্ঠী নিরপেক্ষভাবে বাছাই করা হয়নি।''

উল্লেখিত সমীক্ষাটি গুহন্তির মাদ্রাজ কেমোথেরাপি সেন্টারকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলাফলের সারমর্ম এইরকম - ''ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ১৫৭ জন রোগীর ওপর পথ্যের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা করা হয়। এই রোগীদের এক দলকে স্বাস্থ্যনিবাসে ও অন্য দলকে নিজ গৃহে রেখে আইসোনিয়াজিড ও প্যারা এ্যামাইনো স্যালিসাইলিক এ্যাসিড দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এই রোগীদের প্রত্যেকেই ভিড়াক্রান্ত মাদ্রাজ শহরের দারিদ্রে নিমজ্জিত, গোষ্ঠীজীবনে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য।''

চিকিৎসা শুরুর আগে ও পরে নিজ গৃহে ও স্বাস্থ্যনিবাসে দেওয়া পথ্যের এক তুল্যমূল্য বিচারে যক্ষ্মারোগের ব্যাক্টেরিয়ার নিষ্ক্রিয়তায় পুষ্টির ভূমিকার মূল্যায়ন এই সমীক্ষায় করা হয়েছিল। চিকিৎসা শুরুর আগে এই দুই দলের (series) রোগীরাই একই ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত ছিলেন।

চিকিৎসা শুরুর মাসগুলোতে দুই দলের (নিজ গৃহ ও স্বাস্থ্য নিবাসে বসবাসকারী) রোগীদের পথ্যেরই পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। স্বাস্থ্য নিবাসে বসবাসকারী রোগীরা সারা বছর ধরে বেশি ক্যালোরি যুক্ত স্নেহ পদার্থ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন সহ ফসফরাস ও নানা ভিটামিন যুক্ত পথ্য পান। নিজ গৃহে বসবাসকারী রোগীদের স্বাস্থ্য নিবাসে বসবাসকারী রোগীদের তুলনায় চিকিৎসা চলাকালীন বেশি বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন পথ্যে তাঁদের কিছু ঘাটতিই ছিল।

এক বছর পরে দেখা গেল নিজ গৃহে থাকা রোগীদের এবং স্বাস্থ্য আবাসে থাকা রোগীদের ওজনে গড় বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ১০.৮ পাউণ্ড এবং ১৯.৮ পাউণ্ড (প্রায় দ্বিগুণ)। স্বাস্থ্য আবাসে থাকা রোগীদের এই ওজন বৃদ্ধি কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিয়মিত ওষুধ সেবনের ফল মাত্র নয়। স্বাস্থ্য নিবাসে থাকা চিকিৎসিত রোগীর ক্ষেত্রেই হোক বা নিজ গৃহে বসবাসকারী রোগীর ক্ষেত্রে, এক্স-রে এবং ব্যাকটেরীয় নির্ধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা নির্ণীত চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ার হার-এর সঙ্গে এই সমীক্ষায় পুষ্টিকর পথ্যের কোনও সম্পর্ক নির্ণীত হয়নি, তা ওষুধ ব্যবহারের ফলই এখানে সম্পূর্ণ গুরুত্ব পেয়েছে।

এই ধরনের একটি দুর্বল সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাঠামো তৈরি করা হ'ল। তথ্য প্রমাণকে অস্বীকার করা নির্বোধ রাজনীতির কি অনুপম দৃষ্টান্ত!

ভূপাল ও সরকারি বৈজ্ঞানিককুল

ভারতবর্ষের সরকারি বৈজ্ঞানিকদের ভূপাল গ্যাসকান্ড-সম্পর্কিত কার্যকলাপে সঠিক এবং অবশ্যম্ভাবীকে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল অনীহা দেখা গেছে।

১৯৮৪-র সেই ডিসেম্বরের ২ ও ৩ তারিখের রাত্রি ভূপাল শহরে অবস্থিত এক কারখানা থেকে নির্গত বিপুল পরিমাণ মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস সেই শহরের আবহমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ৮ হাজার মানুষ মারা যান এবং অসংখ্য মানুষ দৃষ্টি শক্তি হারান। বহু মানুষ শ্বাসযন্ত্রের অসুবিধা, মস্তিষ্কের অসংলগ্নতা, অস্বাভাবিক গর্ভধারণ প্রভৃতি নানা অস্বাভাবিকতার শিকার হন। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক মানুষ দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। যে কারখানা থেকে গ্যাস নির্গত হয়েছিল, তার ভূস্তরের জল বিষাক্ত রাসায়নিকে বিপজ্জনক ভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। এই

মধ্য-ভারতে ফুসফুসে যক্ষ্মার ক্ষেত্রে অনাহারজনিত অপুষ্টি একটি সর্বজনীন ঘটনা। এই অপুষ্টি ফুসফুসের যক্ষ্মারোগের সঙ্গে সরাসরি ভাবে সম্পর্কিত। সমীক্ষার আওতায় আসা রোগীদের ৫ শতাংশেরও কম রোগীর ওজন স্বাভাবিক।

জল চুঁইয়ে পরবর্তীকালে ব্যাপক এলাকার জলস্তরকে দূষিত করে। ইউনিয়ন কার্বাইড ভূপালের মানুষদের যে ক্ষতি করেছিল তার বিবরণ দেওয়ার মঞ্চ এটা নয়। ঘটনা পরম্পরা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যে ভারতবর্ষে সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যাঁরা আছেন তাঁরা এই বিশ্লেষণের নামে কি খেলায় মত্ত হয়েছিলেন তা দেখানোর জন্যেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন বা তার উত্তরসূরী ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানি কেউই তাদের কারখানা থেকে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি বা ওই গ্যাসের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট সম্বন্ধে কোনো তথ্যই দিল না। সঠিক সময়ে এই তথ্য পাওয়া গেলে গ্যাস আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসায় অসম্ভব রকমের

সাহায্য হ'ত। ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা পরিষদ (ICMR)-এর ভূমিকা আরও অদ্ভুত। আর্থার কোনান ডয়েল-এর চরিত্র শার্লক হোমস একটি উপন্যাসে ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ''রাত্রে কুকুরটার অদ্ভুত আচরণটা কী লক্ষ্য করেছ?'' ওয়াটসনের উত্তর ছিল - ''কিন্তু কুকুরটাতো সারারাতে কিছুই করেনি।'' হোমস এই কথোপকথনের দাঁড়ি টেনেছিলেন এই বলে যে- ''সেটাই তো অদ্ভুত ঘটনা''।

এই পরিষদ (ICMR) ভূপালে প্রায় ৩৪টা গবেষণা প্রকল্পের সূচনা করেছিল। আমার যতদূর জানা আছে এই প্রকল্পের একটাও শেষ অবধি গড়ায় নি। ধাপে ধাপে গুচ্ছ গুচ্ছ গবেষণা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার দশ বছর পরে ১৯৯৪-এ টিম টিম করে চলতে থাকা শেষ দুটি গবেষণার তথ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়। এই সময়ে আরো ১৮ টি নতুন গবেষণা প্রকল্পের পরিষদ অনুমোদিত প্রস্তাব বাতিল করা হয়।

এই অঞ্চলে মাটির নীচের জলস্তর যে প্রচণ্ড দূষিত, এই সত্যকে সরকারি তরফে বার বার অস্বীকার করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দিল্লীর একটি অ-সরকারি সংস্থা, যাঁদের এ বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম আছে, তাঁরা এই জল পরীক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে এখনো ঐ অঞ্চলে মাটির নীচে জলস্তর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্বারা ভয়ঙ্কর ভাবে দূষিত।

সুবিচারের সন্ধানে

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতিগুলো উল্লিখিত আছে। এই নীতিগুলো স্পষ্ট ভাবে রাষ্ট্রকে নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অসাম্য কমানোর লক্ষ্যে সাম্যের পক্ষে ব্যবহৃত হবে।

সংবিধানের আর্টিকেল ৩৭-এ এই নির্দেশমূলক নীতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ''এই নীতি কার্যকর না হলে তার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই নীতিগুলোর অন্তর্বস্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক এবং এই অন্তর্বস্তুর আলোকেই সরকার আইন প্রণয়ন করবে''। এই প্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যায় সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিষ্কার ভাবে এই নির্দেশ অস্বীকার করেছে যা জীবিকা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অসাম্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি বিষয়ক প্রাক্তন কমিশনার ডা. বি ডি শর্মার মতে আমাদের সংবিধানের পঞ্চম শিডিউল সংবিধানের মধ্যে থাকা আর একটি সংবিধানের মত। এই শিডিউলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাজ্যের রাজ্যপালকে দেওয়া আছে। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে আজ পর্যন্ত কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। PESA আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দেখা যায় সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকের সার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নের অর্থ অট্টালিকা, রাস্তা বা পরিকাঠামো গঠন নয়। বরং সামাজিক ন্যায়, সাম্য এবং যথার্থ অর্থে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই সত্যিকারের উন্নয়ন সূচিত করবে। সম্প্রতি সবাই শান্তির কথা আরো বেশি বেশি করে বলছেন কিন্তু বঞ্চনা ও অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রেখে সত্যিকারের শান্তি নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সাম্য ও ন্যায়ের জন্যে আন্দোলনের মাধ্যমেই সত্যিকারের শান্তি নিয়ে আসা সম্ভব।

এই আলোচনার একদম গোড়াতে আমি সাম্যের রাজনৈতিক ও নৈতিক চরিত্রের অবতারণা করেছিলাম। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমার প্রয়াস ছিল সাম্য অর্জনের অনুশীলনে ঘটনা পরম্পরার প্রভাব অথবা প্রভাবহীনতার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার। তথ্যপ্রমাণাদি অবশ্যই যে কোনো বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থান করে। তথ্যপ্রমাণাদির প্রতি একনিষ্ঠতার কারণেই গ্যালিলিও গ্যালিলেইকে জেলে যেতে হয়েছিল, পুড়ে মরতে হয়েছিল জিওর্দানো ব্রুনোকে। তথ্যপ্রমাণাদি সবসময়ই বংশপরম্পরায় জ্ঞানকে গণতান্ত্রিক করে। এই তথ্য ব্যতিরেকে সমস্ত জ্ঞান এক সামন্ত গুরুর কাছ থেকে গুপ্ত মতবাদের মত আর এক সামন্ত শিষ্যের হাতে বাহিত হবে মাত্র।

সাম্য একাধারে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ধারণা। যদি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন যথেষ্টভাবে সুগঠিত হয়, তবে তাকে তথ্যপ্রমাণাদি দ্বারা কখনোই পুনর্বিন্যস্ত করা যায় না। তথ্যপ্রমাণাদি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। সাম্য সংক্রান্ত এই প্রশ্নের নৈতিক দিকটা হল আমাদের অন্তস্থ ন্যায়পরায়ণতা থেকে উৎসারিত উত্তর। অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "The Idea of Justice"-এ বলেছেন - ''মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো, এমনকি তা যদি মানবধিকার বলে আমাদের কাছে পরিচিত বিষয়গুলোও হয়, তা অবশ্যই আমাদের ন্যায় পরায়ণতা বোধের এক উচ্চারণ, যা আমাদের বলে দেয় কি করতে হবে।" এই অনুজ্ঞা স্বীকৃতি দাবি করে। এই অধিকারগুলোর মধ্যে যে স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে তা উদ্ধার করার জন্যে কর্তব্যগুলোর দিক নির্দেশ করে এই অনুজ্ঞাটি।

ICMR ভূপালে প্রায় ৩৪টা গবেষণা প্রকল্পের সূচনা করেছিল। আমার যতদূর জানা আছে এই প্রকল্পের একটাও শেষ অবধি গড়ায় নি। ধাপে ধাপে গুচ্ছ গুচ্ছ গবেষণা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার দশ বছর পরে ১৯৯৪-এ টিম টিম করে চলতে থাকা শেষ দুটি গবেষণার তথ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়।

তথ্যপ্রমাণাদি নিয়ে কর্মরত একজন মানুষের কাছে এক ভয়ঙ্কর পরিহাস হল এই যে, তাকে এক শক্তির কাছে বারবার আবেদন করে যেতে হবে যে শক্তি সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের প্রতি বারবার উগ্র, বিষম আচরণে রত। তথ্য প্রমাণাদিকে ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণের যাঁরা ছাত্র, তাঁদের এই বিশেষ সমস্যাটা এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একটি নৈতিক ধারণাকে নিয়ে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হলে তা এমন একজন মানুষের মাধ্যমে করতে হবে যিনি সৎ ও খোলা মনের অধিকারী এবং যাঁর আন্তরিকতা সমস্ত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মত আজকের ভারতবর্ষে এটা একটা কষ্টকল্পনা মাত্র। একজন মানুষ এ সমস্ত কিছুর প্রতি বৈরাগ্যের মনোভাব নিয়ে এবং এসব কিছুর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বিকার থাকতে পারেন। কিন্তু এটা যে খুব যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়া এটা আমার মনে হয় না। তরুণ সাংবাদিক রূপে যাঁরা পেশা জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের কাছে আমাদের অন্তস্থ অনুজ্ঞাকে স্বীকৃতি দিয়ে ''কিছু কর্তব্য আমাদের বর্তমান" এই ব্যাকাংশটিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হবে - এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সময় আমাদের কাছে যে যে প্রতিক্রিয়া দাবি করছে আমরা তার যোগ্য কিনা। ❑

পরিচিতি: ডা. বিনায়ক সেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবাধিকার কর্মী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করায় ছত্তিশগড় সরকারের মিথ্যা মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

ডা. সেনের ভাষণের অনুলিখনের অনুবাদ ফোরাম ফর পিপলস হেলথ-এর পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

শত্রুপক্ষের জীবনকথা

The Emperor of All Maladies : A Biography of Cancer আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার সিদ্ধার্থ মুখার্জির লেখা বই। সদ্য-চল্লিশ ছোঁওয়া এই ডাক্তার রোগী দেখার কাজ ও ক্যানসার-সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে ৫৯২ পৃষ্ঠার এক বিরাট বই লিখেছেন। ক্যান্সার রোগ ও সে রোগের সঙ্গে মানুষের লড়াই হল এ বইয়ের উপজীব্য। আমেরিকায় এই বইটি প্রথম প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই নন্-ফিকসান ক্যাটেগরিতে পুলিৎজার পুরস্কার (২০১১) পেয়েছে। সেই বই নিয়ে **আলোচনা করেছেন ডা. সুস্মিতা ঘোষাল।**

ক্লাস পালানো ছাত্রী আমি, মোটা বইকে বেজায় ডরাই। তার উপর সে বইয়ের বিষয়বস্তু যদি আমার পেশা-সংক্রান্ত হয় তা হলে তো তা পাঠ্যপুস্তকের সমগোত্রীয়। কাজেই বহু প্রশংসা শোনা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ মুখার্জীর পুলিৎজার বিজয়ী 'ব্যাধিসম্রাটের জীবনকথা' পড়ার বিশেষ আগ্রহ দেখাইনি। বন্ধুর উপহার বইটি হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে গেলাম, প্রাক্-কথন পড়লাম। পড়তে পড়তে কখন যে মজে গেছি টের পাইনি। প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার বই একনাগাড়ে পড়ার মত অখণ্ড অবসর আর এখন নেই অথচ এ বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। এর অমোঘ আকর্ষণ যেন রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজকে হার মানায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথাকে এমন গল্পচ্ছলে পেশ করেছেন লেখক যে পড়তে কোন ক্লান্তি আসে না।

কি আছে এই বইতে? এক মারণব্যাধির চার হাজার বছর ব্যাপী ইতিহাস অত্যন্ত নিপুণভাবে, সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাসে এই রোগের বর্ণনা আছে, এক নিরাময়হীন কালব্যাধি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই রোগের কারণ ও উপশমের সন্ধান করেছেন নানাজন, নানা দেশে। কেউ সফল হয়েছেন, পেয়েছেন নাম-যশ-অর্থ; কেউ সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেও তীরে পৌঁছতে পারেননি। সেই সব কাহিনী খুঁজে এনে, যত্ন করে সাজিয়ে, নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সুতো দিয়ে মালা গেঁথেছেন সিদ্ধার্থবাবু, পেশায় যিনি কর্কটরোগ-বিশারদ।

সময়ের সাথে সাথে এই রোগ সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণা বহুবার পাল্টেছে। গ্যালেন রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করেছিলেন এক ঘন কালো 'বদরক্ত'কে - পরবর্তীকালে দেখা গেল এই রোগের একটা ধরনের কারণ হল রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য। পারস্যের রানী অ্যাটোসার স্তনচ্ছেদ করে রোগমুক্ত করার চেষ্টা করেছিল তাঁর গ্রীক ক্রীতদাস; আধুনিক যুগে হ্যালস্টেড (Halstead) নিজস্ব পদ্ধতিতে স্তন-ক্যান্সার নির্মূল করার অপারেশন শেখালেন। রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বজায় রাখা তাঁর কাছে ছিল ক্যান্সারকে বৃথা দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো। আবার একশ বছর পরে দেখা গেল সম্পূর্ণ অঙ্গহানি না করেও এ

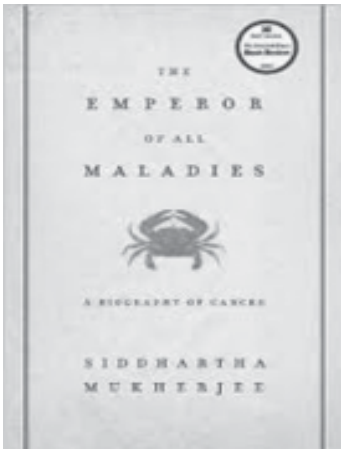

রোগের নিরাময় সম্ভবপর। লেখকের দৃষ্টি শুধু ক্যান্সারের চিকিৎসায় আবদ্ধ থাকেনি; আধুনিক চিকিৎসা জগতের ধাপে ধাপে উন্নতির ফলে কিভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা প্রভাবিত হয়েছে তা ধারাবাহিক ভাবে দেখিয়েছেন তিনি।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে পল এলরিখ্ (Paul Ehrlich) সিফিলিসের রক্তবীজ ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করেন ''ম্যাজিক বুলেট'', শুরু হয় কেমোথেরাপি। ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য এরকম নানা বুলেট ধীরে ধীরে কিন্তু অবধারিত ভাবে আবিষ্কার হয়েছে। লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের উপশম ঘটিয়ে সিডনি ফ্যারবার (Sidney Farber) ক্যান্সার কেমোথেরাপির ''জনক''-এর আখ্যা পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্র ''মাস্টার্ড গ্যাস'' পরবর্তী কালে ক্যান্সারের বিশল্যকরণী হয়ে ওঠে। এসব তথ্য আগেও জানা ছিল। লেখকের বর্ণনার গুণে পাঠ্যপুস্তকের ''শুষ্কং কাষ্ঠং'' এক সজীব আকার ধারণ করেছে। এখানে বিজ্ঞানী শুধু এক বিদেশি নাম নয়, এক ব্যক্তি বিশেষ। তাঁর চেহারা, চরিত্র, কাজের ধরনের একটা স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে মনে, পড়তে পড়তে তাঁর ব্যর্থতা / সাফল্যের অংশীদার হয়ে যাই। ব্রতধারীর নিষ্ঠা, নিয়মানুগতা নিয়ে কেউ খুঁজছেন ক্যান্সারের কারণ, কেউ তার প্রতিকার। লেখক সযত্নে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীর কাজের যোগসূত্রগুলি -এমন সুন্দরভাবে কোন মাষ্টার মশাই তো কখনও বোঝেননি। নিজেও কি এভাবে ভেবেছি কখনও? যুদ্ধজয়ের জন্য নিজেকে ও শত্রুকে সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন। ক্যান্সাররূপী শত্রুকে জানার, তার মনের গভীরে হানা দেওয়ার এই প্রচেষ্টা তাই শুধু ইতিহাস নয়, জীবনকথা হয়ে ওঠে।

এই জীবনকথা শুধু জন্ম-মৃত্যুর সালতামামি নয়। এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতির বৃত্তান্ত। যে কালে প্রকাশ্যে স্তন বা ক্যান্সার উল্লেখ করা ছিল অশালীন, সে কালে এই রোগ ছিল এক গোপন অভিশাপ। রোগী ও তার আপনজনেরা নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করেছে, বিজ্ঞানী লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রতিকূল পরিবেশে, সামান্য উপকরণ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। আবার যখন কোন উঠতি রাজনীতিবিদ বা সমাজের উচ্চকোটির বাসিন্দা এই রোগ নির্মূল করার শ্লোগান দিয়ে জনসমক্ষে আলোড়ন তুলেছেন, মানুষকে সচেতন করেছেন, তখন গড়ে উঠেছে বিরাট তহবিল, হাসপাতাল, উন্নত মানের গবেষণাগার, রাজনৈতিক চাপে সরকারকে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করতে হয়েছে, জারী হয়েছে যুদ্ধ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের

লেখক ডা. সিদ্ধার্থ মুখার্জী

সেনানী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি হয় গোষ্ঠী, সংগঠন। প্রয়োজনে সরকারি লালফিতের ফাঁস এড়াতে উপরমহলে তদ্বির করা হয়েছে। আবার বাণিজ্যিক স্বার্থে চাপ এসেছে অন্যদিক থেকেও। তামাক ব্যবসায়ীরা প্রচার করেছে তামাক সেবন ক্যান্সারের কারণ নাও হতে পারে। বীমা সংস্থাগুলিও পরীক্ষাধীন চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যয়ভার বহন করতে অস্বীকার করেছে। হয়েছে আন্দোলন। প্রবল জনমতের চাপে, আদালতের হস্তক্ষেপে বীমা কোম্পানিগুলি নীতি বদলেছে। নতুন নতুন অস্ত্রসম্ভার নিয়ে মানুষের এই যুদ্ধ জারী আছে আজও।

কয়েকটা খুঁত না ধরলে সমালোচকের নিন্দা হয়। এই বই সমস্ত ক্যান্সারের জীবনী নয়। মানব দেহে যত রকম ক্যান্সার দেখা দেয় তার উৎপত্তি, গতিপ্রকৃতি, চিকিৎসা পদ্ধতি অভিন্ন নয়। লেখক শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু কয়েকটির কাহিনী শোনাবেন। এই বই মূলতঃ কেমোথেরাপির বিবর্তনের কাহিনী, প্রাসঙ্গিক ভাবে অপারেশনের কথা এসেছে। তবে রেডিওথেরাপি, যা আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অত্যন্ত আবশ্যিক, এবং আমার নিজস্ব বিষয়ও বটে, সে এই গ্রন্থে উপেক্ষিতা। তার কাহিনী হয়তো অন্য কেউ শোনাবে। আর এই জীবনকথার সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের বেশির ভাগ গল্পই মার্কিন মুলুকের ইতিহাস। পৃথিবীর সব দেশের অবস্থান মার্কিন-আয়নায় দেখাটা কতটা প্রকৃত চিত্রের পরিচয় - সে প্রশ্নও অবধারিতভাবে এসে যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার GLOBOCAN-এর হিসেব অনুযায়ী - **ভারতে প্রতি ১,০০,০০০ মানুষ পিছু ৯৪৮ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত। ৬৩৩ জন ক্যান্সারে মারা যান ফি বছর।** এই হারে রোগ বাড়লে আমাদের প্রত্যেকের পরিচিত মহলে কেউ না কেউ আক্রান্ত হবেনই এই মারণ রোগে। শত্রুকে চিনে নিতে এই বই বিশেষ সাহায্য করবে পাঠককে। যাঁরা এই রোগের উৎপত্তি, চিকিৎসা, প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করেন, যাঁরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন, যাঁরা দেশের উপযুক্ত স্বাস্থ্যনীতি রূপায়ণের চিন্তা ভাবনা করেন, তাঁদের সবার কাছে এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।❑

লেখক পরিচিতি - ডা. সুস্মিতা ঘোষাল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর চণ্ডীগড়ে পি জি আই এম ই আর থেকে রেডিওথেরাপিতে এম ডি করেন; বর্তমানে সেখানেই অধ্যাপনায় রত। তাঁর পেশাগত জীবন কাটে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায়, গবেষণায়, আর ডাক্তারি ছাত্রদের পড়ানোয়।

কুইজ

স্বাস্থ্যের বৃত্তে এই সংখ্যা থেকে শুরু হতে চলেছে কুইজ বিভাগ। উদ্দেশ্য - মানুষের শরীর, তার অসুখ বিসুখ, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যভাবনা সংক্রান্ত কিছু জানা কিছু অজানা কিছু ভুলে যাওয়া বিষয় পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস।**

প্রশ্ন

১. পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক কে আবিষ্কার করেছিলেন? কত সালে?

২. মানবশরীরে অন্ত্রের কোন অংশ এমনিতে কোন কাজে লাগেনা কিন্তু মাঝে মাঝেই বেশ গন্ডগোল পাকাতে ওস্তাদ?

৩. রক্ততঞ্চন জনিত কোন অসুখকে 'ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের রোগ' বলে উল্লেখ করা হয়?

৪. যক্ষ্মারোগ একটি জীবাণু দ্বারা হয় - সেই জীবাণুর নাম কি?

৫. ফ্লোরিন নামক খনিজ মৌলটি পানীয় জলে মিশে থাকে - কিন্তু জলে এর পরিমাণ ব্যাপারটা দ্বিমুখী করাতের মত কাজ করে- নির্দিষ্ট মাত্রার কম হলে দাঁতের ক্ষয় হয় আর বেশি হলে দাঁত ও হাড়ের ক্ষতি করে। আমাদের দেশে পানীয় জলে এই মৌলের পরিমিত মাত্রা কত?

৬. গুটিবসন্তে একসময় ভারতে বছরে ২ মিলিয়নেরও বেশি লোক মারা যেতেন, অনেক মানুষ অন্ধ হতেন। সারা পৃথিবীতে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত সব মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় এই রোগকে নির্মূল করা গেছে। কত সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা গুটিবসন্ত নির্মূল ঘোষিত হয়?

৭. ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বছরের কোন দিনকে ডায়াবেটিস দিবস হিসাবে পালন করা হয়?

৮. স্লিপিং সিকনেস নামক রোগের জীবাণুর নাম কি? এটি কোন প্রাণী দ্বারা বাহিত হয়?

৯. নিউরোল্যাথিরিসম নামক ব্যাধিটি বিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটি বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের কারণে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যেত। সেই খাদ্যটির নাম কি? খাদ্যটিতে কোন বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি এই রোগের জন্য দায়ী?

১০. চিকুনগুনিয়া নামক ভাইরাস ঘটিত রোগটির নামের সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু গত কয়েকবছর রোগটি আমাদের দেশে বেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রথম কোন দেশে কবে এই রোগটি মহামারী আকারে চিহ্নিত হয়? চিকুনগুনিয়া একটি আঞ্চলিক শব্দ, এই শব্দটির অর্থ কি?

১১. বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে রোগটি মানুষকে সবচেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে সে রোগটি AIDS। পুরো কথাটি কি?

১২. ভিটামিন সি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার মধ্যে একটি আবশ্যিক উপাদান। কোন ফলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে?

১৩. আঙুলের ছাপ দেখে ব্যক্তি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে কি বলে?

১৪. খেলোয়াড়দের হাঁটুতে চোট লাগলে কোন লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?

১৫. ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য কোন গ্যাস দায়ী?

অভিষেক দাস পুনেতে মেডিকেল কলেজে এম বি বি এস পাঠরত

উত্তর ২৭নং পাতায়

সাহাবুদ্দিনের জিন

অহনা মল্লিক

''বাবা, ফটাস্ জলটা এটুক তুমি খাও দেখি।''

গামছায় মুখ মোছে গোপাল। অনেকটা দৌড়ে এসে তিনটে তিপান্নর লোকাল ধরেছে, আজ মনে হয় ছ'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। কাল সকালে আবার কাঁচামাল নিয়ে সেই ভোর চারটেয় আসতে হবে বহড়ু ইস্টিশানে। তবু তার আজ খুশি খুশি লাগে। নীলিমার হাত থেকে ফটাস্ জলের বোতলটা নিয়ে একচুমুকে মেরে দিয়ে পকেটে হাত ঢোকায়, ধীরে সুস্থে পয়সা চুকিয়ে বিড়ি ধরাতে গিয়েও থমকে আবার বান্ডিলটা ঢুকিয়ে রাখে। দুপুরের ট্রেনে এই এক জ্বালা - লক্ষীকান্তপুর লোকালেই সব ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা কেন ওঠে কে জানে। ইস্মোকিং নিষেধ - লাও ঠেলা। মেয়েটা সঙ্গে না থাকলে অবশ্য গোপাল তিন টানে শেষ করত তার লাল সুতোর বিড়ি, বেশি কথা বললে দিত দুটো কাঁচা খিস্তি করে -ব্যাস, বাবু-বিবিরা জানলা দিয়ে আকাশের শোভা দেখার পথ পেত না। আপন মনে একটু হাসে গোপাল।

তবে আজকে তার কাউকে খিস্তি করার ইচ্ছে নেই। বড় হাসপাতালের এই ডাক্তার এমনিতে ভাল। বারুইপুর বাজারের সে ডাক্তারটাও অবশ্য খারাপ ছিল না। কিন্তু রোগটা ধরতে পারছিল না কেউ এতদিন। পারতও না, যদি কাশেমভাই না থাকত। আর তার বউ, নিজের বউ বলে কিনা, ''ছেড়ে দাও ওই মোল্লাদের কথা। এদের জিন আমাদের ঘাড়ে চাপে কখনও?'' গোপাল বোঝে, কথাটা শান্তি বলছে বটে, কিন্তু তার মাথায় ওই সব হিন্দুর ভূত আর মুসলমানের জিনের গল্প ঢুকিয়েছে তার আদরের কলেজে পড়া ভাই। সাধে কি নীলিমা মামাকে দেখতে পারে না, বলে, ''ছেড়ে দাও বাবা, মামুর ওই পন্ডিতি কথা।'' গোপাল অবশ্য কলেজে-যাওয়া শালাকে মনে মনে ভয়ই পায়, কিন্তু সে তো পর-লোক, তার কথায় পাত্তা সে দেয় না। মুশকিল হল নিজের বৌকে নিয়ে। শান্তি - হুঁ, শান্তি না হাতি, মনে মনে গোপাল আজকাল তাকে ডাকে অশান্তি বলে! এমন ছিল না কিন্তু। এই ক'বছর হল কেমন যে বিগড়ে গিয়েছে শান্তি। যাক গে, পকেটে ঢোকানো বিড়ির বান্ডিলের মতই অশান্তিটাকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে সে। আজ এখুনি ওসব দুঃখের কথা ভাবতে রাজি নয় গোপাল, মেয়ের অসুখ ভাল হয়ে যাচ্ছে, ডাক্তারের এই কথাটা মাথায় রেখে বাড়ি ফিরবে, ব্যাস।

নীলিমার পাশটাতে বসেছে বাচ্চা কোলে বউটা, আর বাচ্চাটা খালি লাথি মারছে নীলিমাকে। অন্যদিন হলে নীলিমা দিত ঠিক বাচ্চার মা'র ধুরধুরি নেড়ে। আজকে তার কেমন উদাস লাগে। বসে বসে মনে হয় যেন সে বহড়ু-শিয়ালদা- ডাক্তারখানা-হাসপাতাল-বহড়ু করতে করতেই বুড়ি হয়ে যাবে। গত একবছর তো কম দৌড়ল না। পাড়ার ডাক্তার -

ঘাড় নড়বড়ে হাতুড়ে, সে বুড়ো তার মাথা দেখে বলল টাকপোকা। পিঁয়াজ থেঁতো করে ঘসাল ক'মাস। তাতে চুল পড়া কমে না, মাথার পাশের দিকে পুরো টাকই পড়ে গেল। তারপর বারুইপুর বাজারের সেই ডাক্তারটা। ভিড়ের মধ্যে ঘুপচি ঘরে বসে তিনঘন্টা ঘামা, তারপর ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকতে চান্স পাওয়া। দেখেশুনে বলল তার বাবাকে - ''তোমার মেয়ে নিজের হাত দিয়ে নিজের চুল ছেঁড়ে। এ-রোগের নাম ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া। চুল ছেঁড়ার বাই। মনের রোগ। লাগানোর ওষুধে কিস্যু হবে না। এই মেয়ে, তুই মাথায় হাত লাগাবি না।''

দুটো বড়ি লিখেছিল ডাক্তারটা, খেয়ে তার ঘুম আসত, মাথাটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগত, শিরশির করত। বাবা তাকে বারবার শুধোত - ''কিরে নীলু, নিজের মাথার চুল টানিস নাকি তুই?''

''মাথা তো চুলকোয় বাবা, তাই হাত দিই। নিজের চুল আমি টানি না ...।'' শেষ কথাগুলো খুব আস্তে বলত সে।

তার মা অবশ্য সহজে ছেড়ে দেবার লোকই না। রেগে যায় যখন তখন, আর কি বিচ্ছিরি যে লাগে তখন মা-টাকে।

''ঠিক বলেছে ডাক্তার, তুই তো চুল ধরে টানিস। দেখি না বুঝি আমি কিছু? বাবাকে বোকা বানাস, না! পরশুদিন পড়তে বসে চুল ছিঁড়ে মুখে পুরিস নাই তুই? খেতে দিই না নাকি তোরে আমি?''

''না মা, আমি তো চুলকোচ্ছিলাম মাথাটা। ইস্কুল থেকে উকুন...''

''তোর বাপ পেয়েছিস নাকি আমারে?'' শান্তির গলা চড়ে একটুতেই, ''উকুন, না! উকুন মারা ওষুধটা তুই বাথরুমে গিয়ে ফেলে এলি, বুঝিনি আমি?''

নীলিমা বোঝে, কথা বাড়ালে বিপদ। সে বোবা-কালা-ভালোমানুষ সেজে বসে থাকে। পড়ার বই নিয়ে পাতা ওলটায়। তারপর মার চিল-চিৎকার থামলে টুক করে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সারাদিনই মা'র এই মেজাজ - মুখ খুললে তুবড়ি। ছোটোবেলায় তাকে অত আদর করত যে সেটা এই মা'ই তো? হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বসে খালধারে। একা একা বসে হাত দেয় মাথায়, চুলে, যেন আদর করে পুরোনো মা'র মত করে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে টান মারে ...

বারুইপুরের ডাক্তার চারমাসেও কিছু করতে পারল না। নীলিমার বাপ খোঁজ নেয় এদিক-সেদিক। সবাই বলে, এদিগরে হবে নাই কিছু, কলকাতায় যাও। কলকাতায় এই ডাক্তার ওই হাসপাতাল - সব শুনেটুনে শেষ অব্দি তারা গিয়ে পড়ল এই মিশন হাসপাতালে। সেখানে ভোর থেকে কাজ-কাম ফেলে লাইন দিয়ে টিকিট করাতে হয় বটে, কিন্তু ডাক্তার খারাপ না। বারুইপুরের ডাক্তারের কম্পাউন্ডারের মত তাড়াও লাগায় না কেউ। তা সে ডাক্তারও বলে মনের অসুখ। ওষুধ দেয়। ওষুধ বদলায়। কাজও যেন হয় খানিক খানিক। তারপর তো এই রোজা-বদ্দি ...

* * * * * *

''নীলু, নীলু, কিরে ঘুমাস নাকি তুই!'' গোপাল হন্তদন্ত হয়ে ডাকে। বহড়ু ঢুকছে ট্রেন। নামতেই কাশেমভাই এগিয়ে আসে। নীলিমাকে বাড়ির দিকের ভ্যানোতে তুলে দিয়ে কালকের বাজারের মালের বন্দোবস্ত করতে এগোয় দুজনে।

''কী বলল বড় ডাক্তার?''

''বলবে কি, সেও তাজ্জব। প্রথমে তো বলে, তার ওষুদেই সেরেছে। আমি বললেম, বাবু, তবে এতদিন সারে নাই ক্যানো? ক্যানো কাশেমভাইয়ের চাচাতো ভাই রোজা ডেকে জিন তাড়ানোর পরেই সারল? তখন তার কথা যেন সরে না। শেষে বলল, হুঁ, সেরেছে যখন তখন কথা নাই। ওই ওষুদগুলো যেন ছেড়ো না কিন্তু।''

কাশেম খুকখুক করে হাসে। হাসতে হাসতেই

বলে, ''ওই ওষুদগুলো তো এতদিন জিনের পেটে যেত। তা নইলে অত বড় হাসপাতাল, বড় ডাক্তার, এদিগরের কত মানুষ সেরে গেল, আর তোমার মেয়েই খালি সারে না! তবে কথা হল গে তোমাদের

টক-টক গন্ধে তলিয়ে যায়, মাথা শিরশির করে। সাহাবুদ্দিনের জিন নোংরা মুঠিতে তার হাত ধরে। তার হাত নিজে-নিজেই মাথায় চলে যায়, চুল ধরে টানে। আঃ কী ব্যথা, কী আরাম!

তো আর মৌলবীসাহেব আয়াত শুনিয়ে জিন ছাড়াতে আসবেন না, তাই অযথা মেয়েটারে রোজার ঝাঁটাপেটা খেতে হল।''

* * * *

ওষুধ খায় নীলিমা, ঘুমোয়। তার মাথায় সেই শিরশিরে ভাব, কিন্তু সে আর চুলকায় না।

হাসপাতাল যাবার দিন আসে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে একবার, সে বলে, ''না, আমার আর তো চুল পড়া নাই গো।'' দিন চলে যায়। বাবা তাকে একপাতা ওষুধ এক্সট্রা কিনে দেয়, সে খেতে থাকে। কি বলেছিল যেন হাসপাতালের ডাক্তারটা? চুল ছেঁড়ার মানসিক রোগ, না? ধুর বাজে কথা, সে কি পাগল নাকি, তাই? সকালে একটা বড়ি, মাথা শিরশির, রাত্রে একটা বড়ি, ঘোর-লাগা ঘুম। তার এখন মাথা ভরা চুল। সে স্বপ্নে যে কতকিছু দেখে। স্বপ্নেই লজ্জা পেয়ে যায়। মাঝে মধ্যে তার এমন হয় এখন - স্বপ্ন আর সত্যিতে গুলিয়ে যেতে থাকে। সে ভড়কে যায়, সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি বড়ি খায়, বড়ি ফুরিয়ে গেলে বাবাকে তাড়া দেয়।

মনাকাকাও এদিকে আসে না অনেকদিন। হেই ভগমান, যেন না আসে, যেন ভুলে যায় এদিকের রাস্তাটাই। কেমনভাবে যে লোকটা তাকায় তার দিকেও। জিন-তাড়ানো লোকটা যখন তাকে লঙ্কাপোড়া শুঁকিয়ে জুতোপেটা করছিল, আর জিগ্যেস করছিল, বল শালা বল, কোন্ শালা তুই ঘাড়ে চেপেছিস, সে তো প্রায় বলেই ফেলছিল - মনা দাস। বলে নি অবশ্য, শেষমেশ চার-বছর আগে গলায় দড়ি দেওয়া সাহাবুদ্দিন চাচার নামটা তার মাথায় চলে এসেছিল। ভাগ্যিস! রোজাটা ঝাঁটা একদম আকাশপানে তুলে কি রকম লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল - কোন জিন সাহাবুদ্দিন চাচার রূহ্-কে দিয়ে বদকাজ করাচ্ছে, তাকে তাড়ানোর কত যে কেরদানি -নীলিমা আপনমনে ফিক করে হেসে ফেলে।

* * * * * *

ইস্কুলে পড়া বোধহয় শেষই হতে চলল নীলিমার। মা তাড়া লাগিয়েছে বাপটাকে, একে তো কালো মেয়ে, বয়স বাড়ালে কে আর ঘরে তুলবে। গোপাল পাত্র খুঁজছে, সম্বন্ধ এসেছে একটা। ভাল পাত্র। ছেলের নাকি নিজের দুটো অটো আছে, নারকেল গাছ আছে বারোটা। নিজেদের পাকা বাড়ি। ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে এতদিন নিজের বিয়ের কথা ভাবার সময় পায়নি। গোপাল একটু কিন্তু কিন্তু করছিল, ষোলো বছরের তফাৎ তো চাট্টিখানি কথা নয়। শান্তি মশারি গুঁজতে গুঁজতে বলে, - ''ক্যানো, এখন লয় বিষদাঁত লড়বড়ে, চৌত্রিশ বচর বয়সে চোদ্দ বচরের মেয়ের উপর চড়তি তোমার মিষ্টি লাগে নাই তখন?'' কুঁকড়ে যায় গোপাল, এ-কথার জবাব নাই তার।

নীলিমারও গায়ে জ্বালা ধরে শান্তির কথায়। বাবার আড়ালে মা বলে, তোর বিয়ে নিয়ে আমাদের ভোগান্তি আছে দেখি ঢের। মুখটাতে মলম মেখে ফরসা হতে পারিস না? নীলিমা না কালী-মা। হুঁ, তোর বাপের যত আদিখ্যেতা। বলে আর আয়নায় নিজেকে দেখে। তার মা'টাকে ফরসাই বলা যেতে পারে। তার দেমাক। মনে মনে সে বলে, তোমার দেমাক ভাঙ্গতে পারি আমি, তা জানো? তোমার সব কথা আমার জানা আছে। দেব একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে।

কিন্তু সে তো সত্যিকারের কিছু জানে না। যা সে ভাবে তা নিজের চোখে দেখেনি কোনওদিনও। সবই তার মনের ভুলও হতে পারে; তার তো মনের রোগও আছে, বলেছিল না ডাক্তারে? হেই ভগমান, তার মনের ভুলই যেন হয় সব। ঐ-সব মনে করলে তার গা গুলোয় যেন, কান্না পায়; বহুদিনের ভুলে থাকা অভ্যেস আবার প্রায় ফিরে আসে, তার হাত চলে যায় নিজের মাথার দিকে।

গোপাল আজ আর ফিরবে না। গেছে সেই বসিরহাটের কাছে কোন গাঁয়ে। পাত্র দেখতে। সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে পড়ে নীলিমা। মা পড়া নিয়ে কিটকিট করা এখন ছেড়ে দিয়েছে। তবু আগের দিনই বলে রেখেছে সে - ''সিনেমা দেখতে যাব কিন্তু কালকে, সুতপা আর ইয়াসমিনের সাথে, রাত হবে।'' শান্তি কুটুস কাটে, ''বাপের হোটেলে এসে ভাতটা খেয়ে উদ্ধার কোরো।'' সে কথা বাড়ায় না। নতুন বাংলা সিনেমা - দেব-এর বই। দারুণ দেখতে কিন্তু দেব-টা, ফিগার বানিয়েছে যেন জন আব্রাহাম!

তার কপালটা খারাপ, খুব খারাপ। ইয়াসমিন গেছে খালার বাড়ি, তার নাকি এখন-তখন, আর সুতপা চোখ কপালে তুলে বলে, ''কী রে, কালকেই তো তোকে বললাম আমার বাড়ি ভরতি লোক, সিনেমা দেখা হবে না আমার? সব কথা শুনতে পাস না নাকি আজকাল?'' সিনেমা মাথায় উঠল - ফালতু এতোটা হাঁটা। বাবা যে কেন তাকে একটা মোবাইল কিছুতে দেয় না!

কী আর করা, সে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। কলতলা পেরিয়ে আসতে আসতে নাকে তামাকের গন্ধ লাগে তার। ভালোই হল, তার বাবাটা তাহলে ফিরে এসেছে, একা বসে মায়ের কথা শুনতে এত গা-জ্বালা করে তার আজকাল। কিন্তু না, এ তো বিড়ির গন্ধ নয়, সিগারেট। তার মাথাতে বিপ বিপ করে লাল আলো জ্বলে। ফিরে যা, নীলিমা, ফিরে যা। সে শোনে না। সাহাবুদ্দিনের জিন তাকে তাড়া করে। ঘাড় শক্ত করে এগিয়ে যায় সে। ঘরের দরজা বন্ধ। সে ধাক্কায়, সে চেঁচায়। সে শুনতে পায় না ঘরের মধ্যে পুরোনো খাটটা মড়মড় করে আওয়াজ করে, চাপা গলায় কারা হিসহিস করে কথা বলে, দ্রুত বোতাম আটকায়। দরজা খুলতেই সে সোজা দালানে ঢুকে পরে, কোনো দিকে তাকাবে না সে। তার মা খুব নরম গলায় বলে, ''তোর মনাকাকা এসেছে রে, এই এখুনি।'' সে জানে। মেঝের ওপর পরে থাকা মনাকাকার দেশলাই বাক্সটার ওপরে তার পা পড়ে, সেটা মড়মড় করে।

সে বোঝে, এখুনি বমি করে ফেলবে। দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলে। মাটিতে বসে ওয়াক তোলে। টক-টক গন্ধে তলিয়ে যায়, মাথা শিরশির করে। সাহাবুদ্দিনের জিন নোংরা মুঠিতে তার হাত ধরে। তার হাত নিজে-নিজেই মাথায় চলে যায়, চুল ধরে টানে। আঃ কী ব্যথা, কী আরাম! হাতে চুলগুলি উঠে আসে।

সাহাবুদ্দিনের জিন তার হাত ধরে তার চুলগুলোকে গোল্লা পাকিয়ে মুখে তুলে দেয়।❑

'ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া' কথাটা গ্রিক, তার মানে 'চুল-ছেঁড়ার পাগলামো।' এ হল 'বাধ্যতামূলকভাবে' চুল ছেঁড়ার প্রবণতা। ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেটা অনেকটা মুখ দিয়ে আঙ্গুল চোষার মত সামান্য ব্যাপার। টিন-এজার আর প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মেয়েদের বেশি হয়, এবং এ-সব ক্ষেত্রে রোগটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা অনেকসময় বড় মানসিক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ - ফলে সারানো শক্ত। চিকিৎসা করতে গেলে রোগীকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া (কাউন্সেলিং) ও ওষুধ লাগে। ওষুধগুলি মূলতঃ বিষাদরোগ-বিরোধী ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট)। সেগুলিতে মাথা হালকা ভাব, ঘুম কম বা বেশি হওয়া ইত্যাদি নানা পার্শ্বক্রিয়া হতে পারে। চুল ছিঁড়ে তা খাওয়া ব্যাধিটির বিরল ও খারাপ লক্ষণ।

সম্পাদক, স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চিঠিপত্র

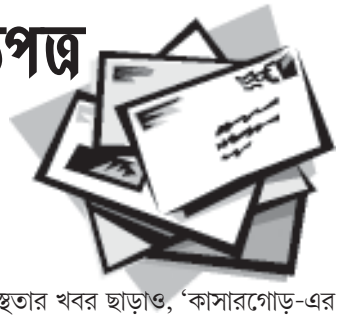

পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠবে আর একটু যত্নশীল হোন

প্রিয় সম্পাদক,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০১১) হাতে পেয়ে খুব ভালো লাগল। সম্পাদকীয় কলামে সৎ তথ্য পরিবেশনার প্রতিশ্রুতি আমাদের মনে আশার আলো নিয়ে আসে। শুধুমাত্র রোগ বা অসুস্থতার খবর ছাড়াও, 'কাসারগোড়-এর অভিশাপ', 'নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ ও আমাদের দেশ', এবং আলমা আটা নিয়ে বিনায়ক সেনের লেখা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং পরিবেশ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক অজানা তথ্য যোগায়।

তবে পত্রিকাতে ছাপা স্কেচগুলি আরেকটু ভালো হলে মানানসই হত। আজকাল তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে ভালো ছবি বা স্কেচ পাওয়া কোনও সমস্যা নয়— এ-ব্যাপারে আপনারা যত্নবান হলে পত্রিকাটি আরো নজর কাড়বে বলে মনে করি।

আগামী কোনও সংখ্যায় যদি চিকিৎসা-বিমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করেন তাহলে অনেকে উপকৃত হবেন। কারণ এই একটা জায়গা যেখানে অসাধু উপায়ে বহু বেসরকারি হাসপাতালগুলি টাকা লুঠছে।

— সুকান্ত বসু, ব্যাঙ্গালোর

*(আমরা খুব শীঘ্র চিকিৎসা-বিমা নিয়ে লেখা প্রকাশ করব— সম্পাদক, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**)*

হাস্য-কৌতুক

●

রাত ১১ টা। পার্ক স্ট্রিটের এক নামী রেস্টুরেন্ট থেকে তিন বন্ধু বেরোলেন। শীতের রাত। একটু বেশিই পান করা হয়ে গেছে। সকলেই কিঞ্চিৎ টলছেন।

একটু হেঁটে পার্কস্ট্রিট মোড়ের কাছে এসে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কিন্তু মাঝরাতে তিন মাতালকে কেইবা ট্যাক্সিতে তুলতে চায়! বিস্তর ঝগড়া ঝাঁটির পর তিন বন্ধু জোর করে উঠে পড়লেন ট্যাক্সিটিতে।

ড্রাইভার সাহেব দেখলেন এ তো মহা বিপদ। এত রাতে তিন মাতালকে নিয়ে সাঁতরাগাছি যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না। তবে গভীর রাতে পার্কস্ট্রিটে যাঁরা ট্যাক্সি চালান, মাতাল চরিয়ে তাঁরা অভ্যস্ত।

ট্যাক্সি ড্রাইভার স্টার্ট দিলেন, কিন্তু গাড়ি চালালেন না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। পাঁচ মিনিট বাদে স্টার্ট থামিয়ে বললেন, ''স্যার, সাঁতরাগাছি এসে গেছে''।

তিন বন্ধুই বেহেড হলেও ভদ্রলোক। প্রথম জন ভাড়া মিটিয়ে দিলেন এবং ধন্যবাদ দিলেন। দ্বিতীয় জন বাড়তি দশ টাকা বখশিস। কিন্তু তৃতীয় বন্ধু ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে সপাটে একটি চড় কষালেন।

ড্রাইভার সাহেব ভাবলেন নির্ঘাত ধরা পড়ে গেছেন। কোনক্রমে গলা উঁচিয়ে বললেন , ''এ কী! মারলেন কেন?''

তৃতীয় মাতাল যাত্রী উপদেশের মত করে বললেন, ''এইবার থেকে আস্তে গাড়ী চালাবে। প্রায় তো মেরেই ফেলেছিলে! এতো জোরে কেউ গাড়ী চালায়?''

●

মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে ভোম্বলের দুটো হাতই ভেঙে গেছে। ডাক্তারবাবু অপারেশন করে ভাঙা হাড়গুলিকে ঠিক করেছেন। তারপর দু'হাতেই প্লাস্টার করে দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু দেখতে এলে দু'হাত তুলে উত্তেজিত হয়ে ভোম্বল ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, ''ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমার হাতের প্লাস্টার খুলে দিলে আমি কী পিয়ানো বাজাতে পারবো?''

ডাক্তারবাবু অবাক! বললেন, ''এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? নিশ্চয় পারবে। সুরে সুরে ভরিয়ে তুলবে চারদিক।''

''আরে বাবা! তাই!'' ভোম্বল দ্বিগুণ উত্তেজিত। ''হাত ভাঙার আগে আমি পিয়ানো বাজাতে জানতাম না।'' ডাক্তারবাবু অবাক! বললেন, ''এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? নিশ্চয় পারবে। সুরে সুরে ভরিয়ে তুলবে চারদিক।''

''আরে বাবা! তাই!'' ভোম্বল দ্বিগুণ উত্তেজিত। ''হাত ভাঙার আগে আমি পিয়ানো বাজাতে জানতাম না।''।

---

advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রপ্তিস্থান :

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।

যোগযোগ : ই-মেল- utsamanush 1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬